কাজের মাঝে রবের খোঁজে

কাজের মাঝে রবের খোঁজে

আফিফা আবেদীন সাওদা

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

কাজের মাঝে

রবের খোঁজে

আফিফা আবেদীন সাওদা

বই :	কাজের মাঝে রবের খোঁজে
রচনা :	আফিফা আবেদীন সাওদা
বিশেষ সহযোগীতায় :	শারিকা হাসান
সম্পাদনা :	আবুল হাসানাত, আব্দুল্লাহ মাহমুদ
বানান ও ভাষারীতি :	যাহিদ আহমাদ, এইচ. এম. সিরাজ
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টীম

কাজের মাঝে রবের খোঁজে

কাজের মাঝে রবের খোঁজে

আফিফা আবেদীন সাওদা

প্রথম প্রকাশ

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

একমাত্র পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 136.00, US $ 10.00 only.

ISBN: 978-984-94844-4-8

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬
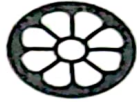
প্রকাশকের অনুভূতি

সভ্যতা কত এগিয়ে গেল, কত বিস্তৃত হলো মানুষের জয়যাত্রা। মানুষ ডুব দিল অজানা গন্তব্যে, ঢুকে পড়ল দুর্ভেদ্য দুর্গে, জয় করল অনিবার্য অসম্ভবকে। তবু মানুষ ফিরল না, ফিরতে চাইল না।

মানুষ অজানা গন্তব্যের পথে ছোটে, কিন্তু তার জন্য অবধারিত যে গন্তব্য—মৃত্যু; সেই গন্তব্যের ব্যাপারে মানুষ কতই-না উদাসীন! কতই-না বেখেয়াল! অথচ একদিন তাকে ফিরতে হবে। প্রস্থান করতে হবে সুনিশ্চিত এক মহাগন্তব্যের পানে। তাকে এমন এক অনিবার্য সত্যের মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে তার সকল কর্মযজ্ঞের হিসেব হবে পুণ্য অথবা পাপের নিক্তিতে। হয় সে ভালো, নয় মন্দ। হয় সে মুক্তি পাবে, নয় সে তলিয়ে যাবে এক অসীম অন্ধকারে।

মানুষের জন্য মুক্তির সব ধারা বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন এবং হাদিসের অমিয় বাণীতে। মানুষ যেখানেই যাক, যে পথেই পা বাড়াক, যে দিকেই মোড় নিক—দিনশেষে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সীমানা থেকে একবিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হতে পারে না। তাকে ঘুরেফিরে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের অধীন হতে হয়। তবুও তার মাঝে অনিঃশেষ অবাধ্যতা। অহংকার আর অহমিকার অন্তর্জালে সে বিলিয়ে দেয় নিজেকে। ফলে পদস্খলন হয় তার।

এমন ভুলো-মনা, ভুলে থাকা মানুষগুলোকে জাগাতে, তাদের অন্তঃকরণে অবাধ্যতার যে আবরণ প্রগাঢ় হয়ে আছে তা সরাতে দরকার উদাত্ত, উদ্বেলিত

আহ্বান। যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয় এবং ভালোবাসা শূন্য, যারা নিজেদের বন্দি করে রেখেছে খেয়াল-খুশির দাসত্বে, তাদের দরকার হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসাময় আলিঙ্গান। সেই আলিঙ্গানে মুছে যাবে অসত্যের সকল অহমিকা। কেটে যাবে সকল জড়তা, ক্লিষ্টতা আর অন্ধকার। তারা ফিরবে, প্রত্যাবর্তন করবে।

বলা হয়, মানুষের জীবন হলো কাজের সমষ্টি। কাজ এবং কাজের মাঝেই মানুষের একটা জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। কেমন হবে, যদি সেই কাজগুলোর ভেতরে খুঁজে ফেরা হয় মহান রবের সন্তুষ্টি? যাপিত জীবনের সকল ব্যস্ততার মাঝেও, সকল আড়ম্বর-অনাড়ম্বর দিবস যাপনের মাঝেও যদি নিজেকে নিবেদিত করা যায় মহান প্রতিপালকের কাছে, কেমন হয় সেই দৃশ্য? কাজের মধ্য থেকে রবকে খুঁজে নেওয়ার জন্য, রবের কাছাকাছি যাওয়ার প্রেরণা নিয়ে আমরা এবার হাজির হয়েছি *কাজের মাঝে রবের খোঁজে* বইটি নিয়ে। বইটি তৃষিত সকল প্রাণকে আলোড়িত-আন্দোলিত করুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনময় দান করেন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

লেখিকার অনুভূতি

আমাকে যখন বলা হলো *কাজের মাঝে রবের খোঁজে* বইটির জন্য লেখিকার বক্তব্য লাগবে'; প্রথমেই মনে হলো, আমি কি আসলেই এ বইয়ের লেখিকা? বইটি নিয়ে আমি কাজ করেছি বটে, তবে নিজেকে এর রচয়িতা মানতে মন সায় দিচ্ছে না। আবার আমি যা করেছি, তাকে না বলা যায় অনুলিখন, না বলা যায় সম্পাদনা। তাই আপাতত 'লেখিকা' ভূষণটাই সই।

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম হাফিযাহুল্লাহ রচিত *Seeds of Rightousness* বইয়ের অনুবাদ দেখে মনে হয়েছিল এর ছায়া অবলম্বনে নতুন করে লিখতে হবে। কিন্তু তখন বুঝিনি, কোনো পাণ্ডুলিপির ছায়া অবলম্বনে নতুন একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করা আমার জন্য কত কঠিন। এমন কঠিন কাজটা কেন করতে গেলাম তা একটু পরে বলছি। আগে বলে নিই কীভাবে করলাম—

সবার প্রথমে নিজেকে একটা ফ্রেমে বন্দি করে ফেলেছিলাম আমি। নিজেই নিজের চারপাশে সীমানার দাগ কেটে নিয়েছিলাম, পণ করেছিলাম এই দাগের বাইরে যাব না। এমনভাবে লিখব না, যেভাবে লিখলে মূল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। অর্থাৎ আমি শুধু আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে মূল রচনার গায়ে নতুন পোশাক পরিয়েছি। কখনো দুটি গল্পের শিক্ষাকে একত্র করে, কখনো একটি গল্পের শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নতুন কোনো গল্প লিখেছি।

এবার আসা যাক মূল কথায়। এই কঠিন কাজটা কেন করতে গেলাম আমি? এর কারণ বইটির বিষয়বস্তু।

মেয়েদের জীবন নিয়ে আমাদের কিছু ছকেবাঁধা গতানুগতিক চিন্তা আছে। সেই চিন্তার বাইরে কিছু করতে গেলে আমরা বলে বসি, 'কী দরকার? ফরয ইবাদত করলেই তো জান্নাত!'

আবার কারও কারও চিন্তা একদম ছকের বাইরে। ফরয ইবাদত থেকে লক্ষ্য সরিয়ে নিয়ে হলেও যেন নফল ইবাদত করা চাই-ই চাই!

সবসময় মনে হতো, এসবের মাঝামাঝি কি কিছু নেই? ভুলত্রুটি আর বেশুমার গুনাহ ঢাকতে কিছু নফল ইবাদত করলে ক্ষতি কী? আবার ফরয বাদ দিয়ে নফলের পিছে ছুটেই-বা কী লাভ?

ঠিক এই চিন্তা থেকেই পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে কাজ করবার লোভ সামলাতে পারিনি। শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম নেক আমলের ঝুলি সমৃদ্ধ করতে এমন সব অভিনব পন্থা বাতলে দিয়েছেন যে, আমার মনে হয়েছে, যেভাবেই হোক এটা পাঠকের কাছে পৌঁছানো উচিত। মেয়েদের কাছে অন্তত এই বার্তাটুকু যাক—ইসলামে কোনো নারীই 'অনাহূত' নন। এখানে সব নারীর জন্যই নেক আমলের দুয়ার খোলা।

ওই যে শুরুতে বলেছিলাম, নিজেকে একটা ফ্রেমে বেঁধে ফেলেছি, এ জন্যই কাজটা আরও কঠিন হয়ে গিয়েছিল। কঠিন কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহ আর আইডিয়া দিয়ে সাহায্য করেছে আমার সহোদরা। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এ বইটিতে আমার লেখার ধরন কিংবা গল্পের গাঁথুনি খুব একটা উচ্চমার্গীয় না হলেও আশা রাখি, কেউ না কেউ বইটা পড়ে উপকৃত হবে, ইন শা আল্লাহ। অন্তত একজনও যদি বইটি পড়ে, তাহলে হয়তো নিজের ইবাদত, আমল নিয়ে ভাবতে পারবে নতুন করে। দৈনন্দিন কাজগুলো দেখতে পারবে ইবাদতের চোখে। আর তার সাওয়াবের ভাগীদার হব আমিও। দিনশেষে এটাই আমার একমাত্র চাওয়া।

আফিফা আবেদীন সাওদা

সূচিপত্র

বিন্দু থেকে সিন্ধু

এক.

মিলিকে আজ বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে ফাতিমা বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করে ফেলেছে, 'মা তোমার কী হয়েছে?'

মিলির কোনো খেয়াল নেই তাতে। মাঝে মাঝে সাড়া দিতে হুঁ-হাঁ করছে। মাথার ভেতর পরিকল্পনার ঝড়—কীভাবে শুরু করা যায়? আচ্ছা, আগে বাসায় যাওয়া যাক।

দুপুরের রান্না ও সকালেই সেরে ফেলেছে। মিলির সব কাজ রুটিনমাফিক চলে। এখন বাসায় ফিরে ফাতিমাকে গোসল করাবে। তারপর সালাত আর মা-মেয়ের খাওয়া-দাওয়া। দুপুরের খাওয়া শেষে ফাতিমার ঘুমানো বাধ্যতামূলক।

এই সময়টাতে মিলিও চেষ্টা করে ঘুমানোর। কেন যেন ঘুম আসে না। ফাতিমা হবার পর ঘুম জিনিসটা বড় আরাধ্য ছিল। আর এখন ফাতিমা বড় হয়েছে, স্কুলে যাচ্ছে। ঘুমানোর যথেষ্ট সময়, অথচ চোখে ঘুম নেই। মিলি অবশ্য এতে একদমই হতাশ নয়। এই সময়টাতে এমন কিছু কাজ করা যায়, যা করার কথা বিগত ছয় বছরে সে ভাবতেও পারেনি। আজকের অলস দুপুরেও মিলি বসে থাকবে না। মাথার ভেতর জট পাকানো আধাআধি পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দেবে।

দুই.

মিলির ছটফটানিতেই কি না কে জানে ফাতিমা একটু দেরি করে ঘুমাল। অস্থির মিলি যথাসম্ভব পা টিপে টিপে চলে গেল বিছানা থেকে নিরাপদ দূরত্বে। পড়ার টেবিলে স্কুলের খাতাগুলো একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা। ফাতিমা নিজেই খুব সুন্দর করে টেবিল গুছিয়ে রাখে। মিলি শুধু একবার দেখিয়ে দিয়েছিল।

ফাতিমার একেকটা খাতা উল্টেপাল্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিলি। ক্লাস ওয়ানের শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। অথচ খাতার অর্ধেকটাই ফাঁকা রয়ে গেছে। ক্লাস টুতে উঠে গেলে এই খাতার আর কোনো কাজ নেই। কাগজের কী নিদারুণ অপচয়!

একে একে সবগুলো খাতা খুলে দেখে সে। সবগুলোর একই দশা। এই খাতাগুলোর সদ্ব্যবহার কি আদৌ সম্ভব?

ফাতিমার বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হতে বাকি আর ১০ দিন। এর মধ্যেই একবার প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে এলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতে স্মার্টফোনটা হাতে নেয় মিলি। ওয়াইফাই অন করে দ্রুতগতিতে ব্রাউজ করে DIY notebook binding.

ব্যস! খাতা বানানোর অজস্র টিউটোরিয়াল একদম চোখের সামনে। এবার পুরোনো খাতা থেকে কাগজ নিয়ে চলছে নতুন খাতা বানাবার প্রজেক্ট।

তিন.

এই মুহূর্তে মিলি আর খাদিজা একটি মহিলা মাদ্রাসার মুহতামিমার সামনে বসা। খাদিজার মেয়েও ফাতিমার সাথে একই স্কুলে পড়ে। এই দুই অভিভাবক মিলে মোটামুটি একটা অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে।

সেদিন পুরোনো খাতা থেকে নতুন খাতা বানিয়ে মিলি ফোন দেয় খাদিজাকে। মিলির উদ্দেশ্য ছিল আরও কয়েকজন অভিভাবককে জানানো। তাহলে তারাও নতুন খাতা তৈরি করে অভাবী কাউকে দান করে দিতে পারবে।

মিলির প্রস্তাবে খাদিজা রাজি হয়। তবে বলেছিল আরও বড় পরিসরে ভাবতে। যার ফলাফল পরদিন বাচ্চাদের স্কুলে হাজির হওয়া। স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে তারা। প্রিন্সিপাল বেশ আগ্রহের সাথে এই প্রজেক্টটিকে স্বাগত জানান। তখনই

পিয়ন পাঠিয়ে ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ দেন ছাত্রীরা যেন বার্ষিক পরীক্ষার শেষ দিন নিজেদের খাতাগুলো নিয়ে আসে।

শত শত ছাত্রী নিজেদের খাতার অতিরিক্ত পেইজগুলো জমা দেয় মিলি আর খাদিজার কাছে। উদ্যোগটা সম্পর্কে জানতে পেরে অনেকে পেন্সিল, ইরেজার, কলম নিয়েও হাজির। প্রিন্সিপালও নিজে থেকে কিছু অনুদান দেন আনুষঙ্গিক খরচ জোগাতে।

এরপর টানা দুই সপ্তাহ তারা ব্যস্ত ছিল খাতা বানানোর কাজে। দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১২০ পৃষ্ঠার মোট ২০০টা খাতা তৈরি হয়ে যায়। সেই খাতার বান্ডিল নিয়ে মিলি আর খাদিজা হাজির হয়েছে কাছেপিঠের এক মাদ্রাসায়। এখানে ইয়াতিম মেয়েরা পড়াশোনা করে।

মাদ্রাসার মুহতামিমা খাতাগুলো খুশিমনে গ্রহণ করেছেন। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে কথা বলেছেন খাদিজা আর মিলির সাথে।

'আপনারা কিন্তু একসাথে দুইটা কাজ করলেন!' হাসিমুখে বললেন মুহতামিমা। 'অপচয় রোধে এগিয়ে এলেন, অভাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার পথও দেখালেন। এতে কী হবে জানেন?'

খাদিজা আর মিলি চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। মুহতামিমা আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনাদের দেখানো পথ ধরে যারাই এ আমল করবে, তার সমপরিমাণ সাওয়াব আপনাদের ঝুলিতে জমা হবে। অথচ তাদের সাওয়াব এতটুকু কমবে না। কী চমৎকার ব্যাপার না!'

জবাবে মিলি আর খাদিজা দুজনেই মুচকি হাসল। সত্যিই এক অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করছে তাদের মনে।

'আপনারা পড়েছেন কি না জানি না, আমি একটা বইতে ঠিক এ রকম প্রকল্পের কথাই পড়েছিলাম। সৌদি আরবের দাম্মাম এলাকায় এভাবে পুরোনো খাতা থেকে চার হাজার পাঁচশোটি খাতা বানানো হয়েছিল।'

'চার হাজার পাঁচশো!' মিলি অবাক।

'জি, দাম্মাম এলাকার সব ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এসেছিল। মলাটের ব্যবস্থা করেছিল দাম্মামের এক দাতা সংস্থা। ছাত্রছাত্রীরা কাগজ দিয়ে সহায়তা তো করেছিলই, সেইসাথে নিজেরাও বসে গিয়েছিল খাতা বানানোর কাজে...'

একমনে বলেই যাচ্ছেন মুহতামিমা। তার মুখটা ঝাপসা হয়ে এসেছে মিলির সামনে। কোনো কথাই আর শুনতে পাচ্ছে না সে। কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেছে মিলি, আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে।

অমরত্বের গল্প

অধ্যক্ষার চোখে পানি। হলরুমে পিনপতন নীরবতা। শত শত ছাত্রী বসে আছে, কারও মুখে কোনো কথা নেই। উন্মুখ হয়ে সবাই অধ্যক্ষার বক্তব্য শুনছে।

আসরের আযান হয়ে যাবে, হাতে সময় নেই। দ্রুত চোখ মুছে অধ্যক্ষা ফিরে গেলেন স্মৃতিচারণে, 'সুমাইয়া বিনতু আহমাদকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। সময় নেই, অথচ মন চাইছে সবটা তোমাদের বলি। তোমরা জেনে নাও কাকে হারিয়েছ। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য যেন এক উপহার ছিল।'

একটু থেমে ছাত্রীদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। প্রিয় ছাত্রী সম্পর্কে বলবার আগে সবার পূর্ণ মনোযোগ চাইছেন যেন।

'একদিন সুমাইয়া এলো আমার রুমে। সালাম দিয়ে আমার কাছে কিছু সময় চেয়ে নিল। মেয়েটা কেন এসেছিল, জানো? আমাকে পর্দার ব্যাপারে নাসিহা দিতে। মূল কথায় যাবার আগে সে এত সুন্দর করে আমার কল্যাণ কামনা করল, যা আমি আজও ভুলতে পারি না। খুব দরদ নিয়ে বলছিল মেয়েটা, মিস আপনি কী সুন্দর হিজাব পরেন! আল্লাহ আপনার এই ইবাদত কবুল করে নিক। আপনি যদি মোজা পরে পা দুটোও ঢেকে রাখতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো! হিজাবে পূর্ণতা আসত, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাও খুশি হতেন।

আমি জানতাম ও যা বলছে, সত্যই বলছে। সত্য কথা সবসময় মনে একটা সুন্দর প্রভাব ফেলে। আমি পরদিনই মোজা পরতে শুরু করলাম। সুমাইয়া সেদিন এও

বলেছিল, মিস আপনি যখন থাকবেন না, তখনো আপনার কথা, আপনার কাজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

কী অদ্ভুত! আমিই থেকে গেলাম। সুমাইয়া চলে গেল আমাদের ছেড়ে।'

অধ্যক্ষা সুমাইয়ার কথা বলেই চলেছেন কান্নাচাপা গলায়। মাত্র ১৫ বছরের একটা মেয়ে। কী উচ্ছলতা, কী প্রাণচাঞ্চল্য! মেয়েটা সেদিনও এসেছিল তার সাথে কথা বলতে। স্কুলের আয়াদের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চায় সে। সব আয়োজন শেষের পথে ছিল, আর দুদিন পরই একজন আলিমার তত্ত্বাবধানে কুরআনের ক্লাস শুরু হবে। সব ঠিকঠাক, কেবল সুমাইয়া নেই। সড়ক-দুর্ঘটনা তার প্রাণ কেড়ে নিল।

তার বক্তব্য শেষে সুমাইয়ার সহপাঠীদের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদানের আহ্বান করা হলো। নীরব হলরুমে গুঞ্জন। সবারই কিছু না কিছু বলার আছে, সুমাইয়া যে সবার বন্ধু ছিল! কিন্তু ডায়াস পর্যন্ত কেউ আসছে না।

হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্টেজে এলো সোনিয়া। এক লাফে গুঞ্জনের আওয়াজ বেড়ে গেল কয়েক ডেসিবেল। শোক ছাপিয়ে সহপাঠীদের চোখে মুখে আতঙ্ক কী বলবে সোনিয়া? সোনিয়া তো সেই মেয়ে, যে কিনা সুমাইয়ার সমস্ত আমল, ভালো উদ্যোগ নিয়ে অবজ্ঞা করত। মেতে উঠত হাসি-তামাশায়।

ধীরপায়ে ডায়াসে এসে দাঁড়িয়েছে সোনিয়া। গতকালও মেয়েটা দুই বেণি দুলিয়ে কলেজে এসেছিল। আজ পরনে হিজাব। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে বক্তব্য শুরু করল রাসুলের ওপর দরূদ পাঠ করে। সহপাঠীরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

'আমি জানি, সুমাইয়ার ব্যাপারে আমি কিছু বলব এমনটা কেউ আশা করেনি। তবু কী মনে হলো জানেন? মনে হলো সহপাঠীদের মধ্যে যদি কারও কিছু বলার থাকে, তবে সেটা আমিই।'

স্তব্ধ শ্রোতাদের আরও স্তব্ধ করে দিয়ে সোনিয়া বলতে লাগল সুমাইয়ার কথা।

ওকে কখনো আমি স্বস্তিতে থাকতে দিইনি। মেয়েটা বাসে সবসময় হেডফোনে কুরআন তিলাওয়াত শুনত, অর্থ পড়ত; মুখস্থ করার চেষ্টা করত।

আমি বলতাম, অ্যাই সুমাইয়া, বাসের ভেতর আঁতলামি করছিস কেন? বাসায় গিয়ে আঁতলামি করিস।

ও একটুও বিরক্ত হতো না। বলত, আসা যাওয়ায় সময়টা গল্প করে কাটিয়ে দিচ্ছি আমরা। এটা কি ঠিক বল? এই সময়টাতে বেশি না, চার-পাঁচটা আয়াত মুখস্থ করলেও কয়েক মাসের মধ্যে একটা বড় সুরা মুখস্থ হয়ে যায়!

আমি মুখ বাঁকাতাম। বলতাম, তোর সব লোক-দেখানো আমল। ও হাসত। জবাব দিত না। অনেকেই সুমাইয়ার দেখাদেখি টাকা জমিয়ে ইসলামি বই কিনত, অবসরে আলিমদের লেকচার শুনত। আমাকে ও অনেক বোঝাত। বলত, দেখ সোনিয়া, আমাদের হাতে সময় নেই। যেকোনো মুহূর্তে আমরা চলে যেতে পারি। হঠাৎ যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিই, রবের সামনে কী নিয়ে দাঁড়াব?"

সত্যিই উদাসীন ছিলাম আমি। শত নাসিহাতেও বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিনি। ওর আকস্মিক মৃত্যু আমার ভেতরটা ওলটপালট করে দিল। আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না...ওর কথা আমার এখনো কানে বাজছে—'হঠাৎ যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিই?'

জানেন, সুমাইয়া একবার বলেছিল ও শহিদি মৃত্যু চায়। আমি আকুল হয়ে চাই, আল্লাহ যেন ওকে শহিদ হিসেবে কবুল করে নেন, ওকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সোনিয়া। হৃদয় থেকে উৎসারিত কান্না ছুঁয়ে যায় সবাইকে। সবার চোখে অশ্রু। সবাই আজ রবের দরবারে সেই মেয়েটির জন্য জান্নাত চাইছে—যার কথা কাজ সবই ছিল দাওয়াতের উজ্জ্বল নিদর্শন।

ডাকি কল্যাণের পথে

অবশেষে বিছানায় পড়েই গেলাম! যেনতেন বেডে নয়, একদম সোজা হাসপাতালের বেডে!

একটা স্কুলে বিজ্ঞান পড়াই আমি। গেল সপ্তাহে স্কুলের বিজ্ঞানমেলা ছিল। আমার চেষ্টা থাকে ছাত্রীরা যতটুকুই শিখুক, তাতে যেন স্রষ্টার মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারে। মেলায় খাটতে হয়েছে প্রচুর। তখন টের পাইনি শরীরের কী বেহাল দশা। টের পেলাম বিজ্ঞানমেলা শেষে। দুই-তিনটা টেস্টের পর ডেঙ্গু ধরা পড়ল। অবস্থা যা ছিল তাতে বাড়িতেও দিব্যি চিকিৎসা চলত। তবু বাড়িতে থাকলে বিশ্রাম নেব না জেনেই বুঝি আমাকে হসপিটালে ভর্তি করিয়ে দিল সবাই।

ওদিকে আমার মন পড়ে আছে স্কুলে। বেশিদিন হয়নি স্কুলে জয়েন করেছি। ইসলামি স্কুল, বেশ আগ্রহ নিয়ে সিভি জমা দিয়েছিলাম। উম্মাহর জন্য কিছু করার ইচ্ছা থেকেই এই পেশায় আসা। তখনই নিয়ত করেছিলাম বেতনের পুরো টাকাটা সাদাকা করে দেবো।

জয়েনের পর কিছুটা হতাশ হতে হলো। স্কুলটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। দাওয়াতি কাজে কোনো অগ্রগতি নেই। আগে হালাকার আয়োজন হতো, এখন তাও হচ্ছে না।

ক্রমাগত সাহায্য চাচ্ছিলাম আল্লাহর কাছে। প্রথমে শিক্ষকদের দাওয়াত দেবার নিয়ত করলাম। শিক্ষকরা যখন দ্বীনচর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে, শিক্ষার্থীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। টিচার্সরুমে ইসলামি বই নেড়েচেড়ে দেখতাম।

একদিন এক সিনিয়র শিক্ষিকা পাশে এসে বসলেন। বেশ আগ্রহভরে জানতে চাইলেন কী পড়ছি। সুযোগ হাতছাড়া করলাম না, সারমর্ম বললাম। এমনভাবে বলার চেষ্টা করলাম যাতে বইটা পড়তে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে বইটি উপহার দিয়েছিলাম তাকে।

এভাবে সুযোগ পেলেই সব শিক্ষিকার হাতে ইসলামি বই ধরিয়ে দিতাম। কখনো-বা কোনো লেকচারের অডিও লিংক।

এর কিছুদিন পর সেই সিনিয়র শিক্ষিকা খুব আফসোস করলেন। বিগত পাঁচটা বছর হেলায় হারিয়েছেন। দ্বীন নিয়ে একটুও ভাবেননি। দুনিয়ার মোহে মজে ছিলেন।

তার বোধোদয় হতে দেখে কী যে শান্তি লেগেছিল বলে বোঝাতে পারব না! আমরা শিক্ষিকারা নতুন উদ্যমে ছাত্রীদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবর্তনটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দাওয়াতি কাজ চলছিল প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এমন আনন্দের মুহূর্তেই ডেঙ্গু ধরা পড়ল। বন্দি হলাম হাসপাতালের বেডে। আল্লাহর নির্ধারণ, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন—এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। তবু কি মন মানে! একটা দুঃখবোধ রয়েই যাচ্ছিল। স্কুলে থাকতে পারলে দ্বীনের দাওয়াতে আমিও শরিক হতে পারতাম।

অবশ্য এ নিয়ে হতাশায় তলিয়ে যাওয়ার মানে নেই কোনো। ইসলামি লেকচার, কুরআন তিলাওয়াত শোনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম আগের মতোই।

একদিনের কথা। হালকা ভলিউমে কুরআন তিলাওয়াত চলছে। পাশের বেডের বৃদ্ধা হঠাৎ ডাকলেন আমাকে। ফিরে তাকাতেই বললেন, 'আওয়াজটা একটু বাড়িয়ে দাও না, আমিও শুনি!'

খুশি হলাম খুব। ভলিউম বাড়িয়ে দুজন মিলে তিলাওয়াত শুনতে লাগলাম। এরপর তার সাথে অনেক আলাপ হয়েছে আমার। ভদ্রমহিলার ইসলামি জ্ঞান তেমন একটা ছিল না। সুযোগ পেয়ে যতটা সম্ভব তাকে জানানোর চেষ্টা করলাম।

আরেকদিনের কথা। সুন্নাহসম্মত যিকির আর দুআর একটা বই পড়ছিলাম। সে সময় ডিউটিরত ডাক্তার দেখতে চাইলেন বইটা। ইসলামি বই নিয়ে আলোচনা হলো বেশ। তার ইচ্ছা হাসপাতালের করিডোরে একটা বুকশেল্ফের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে যাবতীয় ইসলামি বই থাকবে, বিশেষ করে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দাওয়াতি বই।

জন্ম-মৃত্যু চোখের সামনে দেখার স্থান এই হাসপাতাল। কেউ আসছে রোগী হয়ে, কেউ যাচ্ছে লাশ হয়ে, কেউ-বা আবার নবজাতককে বুকে জড়িয়ে ঘরে ফিরছে। এ সময়টায় মানুষের মন নরম থাকে, সত্য জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে।

দ্বীন প্রচারের সুবর্ণ এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না এই ডাক্তার ভদ্রমহিলা। রোগীদের সবসময় ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন। ফরয ইবাদতের তাগাদা দেন, নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে যান।

আমাকে আর বৃদ্ধাকে দেখে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কী মনে করে ফিরে এলেন। ইতস্ততভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'রোগীর সুস্থতা কামনা করে কোনো সুন্নাহসম্মত দুআ নেই?'

মনটা আনন্দে ভরে গেল। যিকির ও দুআর বইটা খুলে তাকে দুআ বের করে দিলাম। স্মার্টফোন বের করে দুআর ছবি তুলে নিলেন তিনি। আমাকে আর পাশের বৃদ্ধাকেও দুআ পড়ে দিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধার এক ভাগ্নি এলো তাকে দেখতে। খালার জন্য ফুল কিনে এনেছে সে। তা-ই দেখে বৃদ্ধা ধমকে উঠলেন, 'এই ফুল আনার কালচার কোথা থেকে আমদানি করেছিস? এমনিতেই ফুলের যা দাম! কী দরকার ছিল এসবের?'

'আহা খালা! তুমি টিভিতে দেখোনি, বাইরের দেশে রোগী দেখতে গেলে ফুল নিয়ে যায়?'

'কিন্তু আপু, কাফিরদের অন্ধ-অনুসরণ করতে তো আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।' তাদের আলোচনার মাঝে অনাহূত অতিথির মতো আমি বলে উঠলাম, 'রোগী দেখতে যাওয়ার কত সুন্দর সব রীতিনীতি আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে গেছেন!'

বৃদ্ধার ভাগ্নি মনে হয় খানিকটা বিব্রত হলো। তাকে বিব্রত করবার ইচ্ছা অবশ্য ছিল না আমার। হুট করে তাদের আলোচনায় ঢুকে যাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলাম। বৃদ্ধাও কোমলসুরে ভাগ্নিকে বোঝালেন অনেক কিছু। আমাকে বললেন ভাগ্নিকে যেন রোগী দেখতে আসার দুআ শিখিয়ে দিই।

আল্লাহর পরিকল্পনা কত অদ্ভুত! ভেবেছিলাম এই বুঝি দাওয়াতি কাজে ভাটা পড়ল। অথচ পরম করুণাময় বিছানাবন্দি এই আমাকেও দ্বীনের দাওয়াত দেবার সুযোগ করে দিলেন।

বরকতময় বিনিয়োগ

মসজিদ থেকে আসরের আযান ভেসে আসছে। হাতের বইটা রেখে সালাতের প্রস্তুতি নিল ফারিহা। মাগরিবের পরই ড্রাইভার সিরাজ ভাই আসবেন। তার কাছে বইগুলো দিতে হবে কুরিয়ারের জন্য। আজকে মোট ২০টা পার্সেল দেশের বিভিন্ন ঠিকানায় কুরিয়ার করার ইচ্ছা।

সালাম ফেরাতেই সালমা হাজির। সালমা ফারিহাদের নতুন প্রতিবেশী। প্রাণোচ্ছল একটা মেয়ে। ফারিহার সাথে বই প্যাকিংয়ে বসে গেছে। সেইসাথে টুকটাক গল্প চলছে।

'কবে থেকে এই প্রজেক্ট চালু করলেন আপু?' আগ্রহভরে জানতে চাইল সালমা। এই প্রজেক্টের আদ্যোপান্ত জানার বড় শখ তার।

'সে তো প্রায় চার বছর হতে চলল। তুমি কি ফাতিমাকে চেনো? সেকেন্ড ফ্লোরে থাকে।'

'জি আপু, চিনি।' দড়ি দিয়ে শক্ত করে তিনটা বই বাঁধছে সালমা। একটা ইসলামি আকিদার বই, আর দুইটা মুসলিম নারীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক বই।

'আমি আর ফাতিমা একদিন গল্প করছিলাম। এ-কথা সে-কথা থেকে অপচয়ের প্রসঙ্গ উঠল। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমরা দুজনেও কম অপচয় করি না। বিশেষ করে হাত খরচের টাকাটা প্রায়ই খেয়াল খুশিতে ব্যয় করে ফেলি। হয়তো একটা ক্র্যাফট ম্যাটেরিয়াল পছন্দ হয়ে গেল, হুট করে কিনে ফেললাম। ওয়ারড্রোবে জামার অভাব নেই, তবু চোখের খায়েশে একটা জামা কিনে ফেললাম। এমনই অবিবেচকের

মতো খরচ করতাম আমরা। সে রাতে দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম হুটহাট শখ পূরণে লাগাম টানব। উম্মাহর অভাবীদের কথা ভেবে হলেও অপচয় কমিয়ে দেবো।'

একনাগাড়ে কথা বলে একটু দম নিল ফারিহা।

'তারপর? শুরুটা কী করে হলো?'

'তারপর প্রতিমাসে অল্প অল্প করে টাকা জমানো শুরু। একটা মজার বিষয় কী, জানো? প্রথম প্রথম খরচ কমিয়ে টাকা জমানো অসম্ভব মনে হতো। কিন্তু মাস শেষে দেখতাম একটু হিসেব করে চললেই টাকা জমানো সম্ভব।

প্রথম দুই মাস আমাদের জমানো টাকা একটা দাতাসংস্থায় দিয়েছিলাম। ততদিনে আমাদের এই উদ্যোগের কথা অনেকেই জেনে গেছে। ক্লাসমেট, আত্মীয়স্বজন যারাই শুনেছে, সবাই বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তৃতীয় মাসে আমাদের কাছে মোটামুটি ভালো অঙ্কের টাকা জমা পড়ে। সেই টাকা দিয়ে আকিদা-সহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর লেখা কিছু বই কিনতে শুরু করি আমরা। তখন থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বইগুলো পাঠাচ্ছি। এখন তো প্রতিমাসে দুইশো থেকে আড়াইশোটা পার্সেল যাচ্ছে, আল-হামদু লিল্লাহ।'

'মা শা আল্লাহ, কী চমৎকার আইডিয়া আপু! অপচয় রোধ করতে গিয়ে কত সুন্দর একটা প্রজেক্টের অংশ হয়ে গেলেন!' সালমার বিস্ময় কাটছে না।

'আল-হামদু লিল্লাহ।' মৃদু হাসল ফারিহা। 'আসলে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন বলেই এতটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছি আমরা। প্রতি বছরই এই উদ্যোগকে একটু একটু করে বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তারপরও বই কেনার পর বছরশেষে কিছু টাকা থেকে যায়। সেই টাকাগুলো আমরা বিশ্বাসযোগ্য কিছু দাতাসংস্থাকে দিয়ে দিই। শীতের সময় দরিদ্রদের কম্বল দেওয়া, শরণার্থীদের জন্য টিউবওয়েল বসানো—এ রকম আরও কিছু প্রজেক্টে আমাদের দেওয়া অর্থ কাজে লেগেছে।'

সালমা তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিল ফারিহার কথা। ঘোর ভাঙল মাগরিবের আযানে। সালাত শেষে ফারিহার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল সে। রিকশাভাড়া থেকে বাঁচানো টাকা। কে না চায় এমন বরকতময় কাজের অংশীদার হতে!

ভ্রমণের ফাঁকে

এক.

বিষণ্ন মনে ব্যাগ গোছাচ্ছে নিতু। এই মাসে টানা তিনদিন ছুটি পড়েছে। সেই উপলক্ষ্যে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা মিলে ঘুরতে যাচ্ছে একটা রিসোর্টে।

রাশেদ খুশিতে একরকম লাফাতে লাফাতেই নিতুকে বলেছিল ঘুরতে যাবার কথা। কিন্তু নিতুর মন সায় দেয় না। কেন যেন সব দেখা-সাক্ষাতের উপলক্ষ্যগুলো শেষমেশ গীবতের আসরে পরিণত হয়। তাই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সংবাদ ওকে উদ্বেলিত করে না, বরং শঙ্কিত করে তোলে।

'তুমি শুধু ঘুরতে যাবার খারাপ দিকটাই দেখলে?' ওর অনীহা দেখে আহত স্বরে বলেছিল রাশেদ। 'আত্মীয়দের দ্বীনের দাওয়াত দেবার কী অভাবনীয় সুযোগ পাচ্ছ, সেটা ভেবে দেখলে না? আমরা কি চাই তারা সারা জীবন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে থাকুক?'

এরপর আর কোনো কথা চলে না। নিতু ব্যাগ গোছাতে শুরু করেছে। রাশেদের কথায় যুক্তি আছে। তবু মনটা খচখচ করে। এত বড় দায়িত্ব পালন করতে পারবে তো?

সবকিছুর আগে মন শান্ত করা জরুরি। তাই ব্যাগ গোছানো বাদ দিয়ে নিতু ফোন দিল যাইনাব আপুকে। দাওয়াতি কাজে তার জুড়ি মেলা ভার।

আপুর কথায় কী এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা কাজ করে, মন শান্ত হতে বাধ্য। নিতুর কাছে সবটা শুনে তিনিও রাশেদের কথায় সুর মেলালেন। বললেন, 'নিতু এমন সুযোগ আর পাবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হবে, দ্বীনের দাওয়াতও দিতে পারবে। কেন দ্বিধায় ভুগছ?'

'আপু, আপনি তো সবই জানেন! আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের ইসলামি জ্ঞান প্রায় শূন্যের কোঠায়। অধিকাংশ মহিলাই পর্দা করে না। এই অবস্থায় আমি কীভাবে কী করব?'

যাইনাব মৃদু হাসল, 'দেখো নিতু, আল্লাহ তাঁর পথে ডাকার দায়িত্ব দিয়ে আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হেলায় হারাতে চাচ্ছ? তোমার চেষ্টা তুমি করবে, কবুল করার মালিক আল্লাহ।'

'কিন্তু আপু...'

'কোনো কিন্তু না। আল্লাহর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না? তুমি কি তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছ এ ব্যাপারে?

নিতু, এমন তো হতেই পারে, তোমার আত্মীয়দের দ্বীনের আলোয় আলোকিত করতে আল্লাহ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। পারে না? তুমি কি এ সুযোগ গ্রহণ করবে না? তাঁর কাছে সাহায্য চাও, এই দায়িত্ব কাঁধে নেবার শক্তি চাও।'

যাইনাবের কথা নিতুর জন্য টনিকের মতো কাজ করে। সে প্রবল উচ্ছ্বাসে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে। কিছু কেনাকাটা করতে হবে আত্মীয়দের জন্য। ছোটখাটো একটা লিস্ট বানিয়ে অনলাইনে অর্ডার করে দিল। 'অনলাইন শপিং' বরাবরই আল্লাহর দেওয়া নিআমত মনে হয় নিতুর কাছে।

দুই.

রিসোর্টটা খুব সুন্দর আর ছিমছাম। ভীষণ ভালো লেগেছে নিতুর। রাশেদ ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে আশেপাশের জায়গাটুকু। যা দেখা যাচ্ছে, তার সবটাই সুন্দর। অনন্তকাল এখানে ঘুরে বেড়ালেও বিরক্ত লাগবে না—এমন একটা পরিবেশ। এত কিছুর মাঝেও নিতু তার দায়িত্বের কথা ভোলেনি। বাসে উঠেই পরিবারের নারী সদস্যদের ইসলামি বই উপহার দিয়েছে, সঙ্গে হিজাব আর নিকাব। আর ছোট বাচ্চাদের চকলেট।

লাঞ্চের সময় একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিল অবশ্য। মাহরাম, গায়রে মাহরাম মিলেমিশে একেকটা টেবিলে বসে পড়েছে। নিতু বসার জায়গা পাচ্ছে না। শেষমেশ তার শাশুড়িকে বলতেই কয়েকজন মুরুব্বি মহিলা জড়ো করে ফেললেন তিনি। নিতুকে সঙ্গ দিতে তারা সবাই মিলে একটা কোণার টেবিলে বসল। অনেকদিন হলো সে নিকাবের আড়ালে খাওয়া-দাওয়া রপ্ত করে ফেলেছে। হিজাব পালনে ওর চেষ্টা দেখে এক মুরুব্বি বলেই বসলেন, 'আমাদেরও এমন করেই পর্দা করবার কথা ছিল।'

নিতু উৎসাহ দিল তাকে। বলল, 'আল্লাহ সবসময় তাঁর বান্দার জন্য ফিরে আসার দরজা খুলে রেখেছেন। আপনি চেষ্টা করলে এখনো সুন্দরভাবে পর্দা করতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।'

বিকেলে নিতুর পক্ষ থেকে ছোট বাচ্চাদের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। সব বাচ্চা ওকে ভালোবেসে ফেলেছে। কাছে বসিয়ে সাহাবিদের গল্প শুনিয়েছে নিতু। কুরআন থেকেও শিখিয়েছে কিছু চমৎকার বিষয়। একসময় দেখা গেল বাচ্চাদের মায়েরা, তরুণীরাও হাজির নিতুর আসরে।

সবচেয়ে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল রাতের খাবারের সময়। নারী-পুরুষ একসাথে বসতে নিতুর অস্বীকৃতি সবার চোখে পড়েছিল। আর তাই রাতে নারীরা একপাশের টেবিলে বসল, পুরুষরা ভিন্ন টেবিলে। ফ্রি মিক্সিংয়ের কোনো অবকাশই রইল না আর। নিতু ভাবতেও পারেনি সামান্য একটা কাজের ফলাফল এত দ্রুত পেয়ে যাবে।

তরুণীদের সাথেও নিতুর সখ্যতা গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। ফিরে যাবার দিন সে অবাক হয়ে দেখল, যে মেয়েটা পর্দার মৌলিক বিষয়গুলো জানত না, সেই মেয়েটাও ওর দেওয়া হিজাব পরে বাইরে বেরিয়েছে।

অশ্রুতে চোখ ঝাপসা নিতুর। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে কী না হয়! বারবার মনে পড়ছে যাইনাব আপুর কথা—

> **এমন তো হতেই পারে, তোমার আত্মীয়দের দ্বীনের আলোয় আলোকিত করতে আল্লাহ তোমাকেই মনোনীত করেছেন। তুমি কি এ সুযোগ গ্রহণ করবে না?**

শখগুলো সব অন্যরকম

সুমাইয়া, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারিজে স্নাতক। ঘরে বসে কীভাবে নিজের জ্ঞান কাজে লাগানো যায় ভাবতে ভাবতেই মাছ চাষ শুরু করেছিল সে। বাড়ির ছাদে শুরু হলো পরীক্ষামূলকভাবে কই আর পাবদার চাষ।

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ‘তোমার শখ কী?’ সে অকপটে উত্তর দেয়, ‘মাছ চাষ।’ সবাই একটু অবাক হতো প্রথম প্রথম। অবাক হবার দিন শেষ। এখন অনেকেই ওর কাছ থেকে মাছ কেনে।

মাছ বিক্রির টাকাটা সুমাইয়া ব্যয় করে সাদাকায়। দান করে দেয় গরীব দুঃখীদের মাঝে।

☆☆☆

রাঁধতে ভালোবাসে আনিকা। দেশি কিংবা বিদেশি যেকোনো রান্নায় তার সীমাহীন আগ্রহ। সেদিন মালয়েশিয়া থেকে চাচাতো বোনের ফোন। একদিকে বোনের সাথে কথোপকথন, অন্যদিকে তেলেজলে পাঁচফোড়নের সংঘাত। আওয়াজ পৌঁছে গেল সুদূর মালয়েশিয়া পর্যন্ত।

বোন খানিকটা ভর্ৎসনাই করল। কেন এতটা সময় রান্নার পেছনে ব্যয় করছে আনিকা? এই সময়টা কি উম্মাহর স্বার্থে ব্যয় করা যেত না! আনিকা জবাব দেয় না। মৃদু হেসে প্রসঙ্গ পালটে ফেলে।

শখের রাঁধুনি আনিকা রান্না করা খাবার নিয়ে যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে। এক হাতে খাবারের বাটি, আরেক হাতে সুন্দর একটা ঈমান জাগানিয়া বই। পাশের বাড়ির সন্তানসম্ভবা মেয়েটা জানে একবেলা রান্নার ঝক্কি থেকে বেঁচে যাওয়া কতটা সুখের। আনিকা তাকে সেই সুখটাই দিতে চায়।

☆☆☆

সদ্য কলেজে ওঠা ছেলেমেয়েরা বড্ড তাড়াহুড়ার মাঝে থাকে। ধৈর্য নিয়ে, সময় নিয়ে কিছু করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সায়মা এর ব্যতিক্রম। ১৭ বছরের সায়মা দাদির কাছে সুন্দর কুশিকাটার কাজ শিখেছে। ছোট্ট তুলতুলে জুতা থেকে শুরু করে মাথার টুপি, সোয়েটার, ম্যাট্রেস কত কিছুই-না বানায় সে!

আল্লাহর ইচ্ছায় সেসব বিক্রিও হয়ে যায় খুব দ্রুত। বিক্রির টাকাটা সায়মা বিধবা খাদেমাকে দেয়। তার ছেলের পড়ালেখার খরচ।

☆☆☆

সাফিয়া শখের বশে আচার বানায়। রাস্তার ধূলোবালি আর রং মেশানো আচারের থেকে ওর আচার কম সুস্বাদু নয়, বরং স্বাস্থ্যকর।

একদিন এক বোন ওকে চমৎকার পরামর্শ দিল। সাফিয়া চাইলেই এই শখকে দ্বীনের কাজে লাগাতে পারে। আচার খেতে কে না ভালোবাসে! কেবল অস্বাস্থ্যকর বলেই কিনে খায় না। সাফিয়া যদি ঘরে বানানো আচার বিক্রি করে, তবে কেনার মানুষের অভাব হবে না। আর বিক্রির অর্থ কোথাও সাদাকা করে দিতে পারলে সাওয়াবের খাতাও ভারী বৈ হালকা হবে না!

☆☆☆

তড়িঘড়ি করে সেলাই করা কাপড়গুলো ভাঁজ করছে সুরাইয়া। আজ মেয়ের স্কুলে হালাকা[১] আছে। গত এক মাস ধরে বেশ কয়েকটি সালাতের পোশাক, ছোট বাচ্চাদের জামা বানিয়েছে সে। হালাকার দিন অভিভাবকরা আসে। সুরাইয়ার কাছ

---

[১] দ্বীনের উদ্দেশ্যে কোনো তালিম, আলোচনা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য সমবেত হওয়াকে হালাকা বলে। সহজ কথায়, হালাকা একটি দ্বীনি মজলিস।

থেকে পছন্দ করে জামা কিনে নিয়ে যায়। বিক্রির টাকা দিয়ে সে ইসলামি বই কিনে বিতরণ করে অভাবীদের মাঝে।

☆☆☆

আফিয়া তার ফুপুর বাড়িতে এসেছে। ছোট ফুপাতো বোনের জন্য এনেছে কমলা আর শসা। বাগান করতে খুব ভালোবাসে সে। বারোমাসি ফল আর সবজির গাছ লাগিয়েছে। নিজের গাছের সবজি, ফল প্রতিবেশী আর আত্মীয়দের মাঝে বিলিয়ে দেওয়াতেই ওর সুখ।

☆☆☆

শারমিন বই পড়তে ভালোবাসে। গল্প উপন্যাসে বুঁদ হয়ে থাকা শারমিন যখন দ্বীনের পথে আসে, তখন নিজের পছন্দকে একটু বদলে নিল। এখন তার সময় কাটে ইসলামি বই পড়ে। প্রতিটা বই পড়া শেষে একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করে সে। কখনো কোনো হালাকায় গেলে সেই সারসংক্ষেপের ফটোকপি বিতরণ করে বোনদের মাঝে। যাদের বড় বই পড়বার অভ্যাস নেই, তারা শারমিনের লেখা সারসংক্ষেপ পড়ে উপকৃত হয়। অনেকের মাঝে আবার সেই বইগুলো পড়বার আগ্রহও জন্মায়।

শখগুলো স্রেফ সময় কাটানোর মাধ্যম নয়। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার উপলক্ষ্য নয়। আত্মকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদিতাকে উস্কে না দিয়েও শখ মেটানো সম্ভব। মুসলিম বোনদের শখগুলো হোক দ্বীনের পথের পাথেয়।

সুসন্তান

কাঁচা সুপারি দেওয়া পান চিবুতে চিবুতে গল্প করছে সুলতানা। ছেলেবেলার দুই বান্ধবী মিতু আর হাফসাকে দাওয়াত দিয়েছে আজ। কাঁচা সুপারি ধরেছে, ফোলা গাল লাল হয়ে গেছে। পানের রস ফেলে এসে হাত পা নেড়ে গাল ফুলিয়ে বান্ধবীদের সাথে গল্পে মেতে উঠেছে। মাঝে মাঝে শখের বশে পান খায় সে।

'কীরে হাফসা! নিজে নাহয় হুজুর হয়েছিস! তাই বলে এত কম বয়সে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিবি? বউকে সে খাওয়াবে কী?'

হাফসা মৃদু হাসে। শান্তভাবে উত্তর দেয়, 'যতদিন ওর আয় রোজগারের পথ হবে না, আমরাই খাওয়াব। একটা বাড়তি মানুষ খাওয়াতে-পরাতে আর কত টাকাই লাগে বল?'

'কী বলছিস! আমরা তো একটা সমাজে থাকি, নাকি? এখানে এসব মানায়? কোনো পাপের পথে যাচ্ছিল না তো?' গলা নিচু করে চোখগুলো সরু করে ফেলে সুলতানা।

মিতু বলে ওঠে, 'আরে ধুর! কী যে বলিস! হাফসার ছেলে বাচ্চা নাকি! এর চেয়েও কম বয়সে সাহাবিদের বিয়ে হয়েছে।'

'তাদের সাথে আমাদের তুলনা!' মুখ বাঁকায় সুলতানা। 'ওই সময় এসব স্বাভাবিক ছিল। আমার বুমিটাকে দেখ না। ১৬ বছর হলো, কিচ্ছু বোঝে না। প্রতি ঘণ্টায় খাবার নিয়ে পিছু ছুটি। তোরা তো জানিসই আমি আমার বাচ্চার কেমন যত্ন নিই।'

ছেলের যত্ন নিয়ে বেশ আত্মতৃপ্তিতে ভোগে সে।

'সুলতানা, শুধু স্বাস্থ্যের পিছনে ছোটাই কিন্তু সন্তান প্রতিপালনের সবকিছু নয়। একটা সন্তান বীজের মতো। বীজ থেকে একদিন বৃক্ষ হবে...'

'প্লিজ, জ্ঞান কম ঝাড়।' মিতুকে কথা শেষ করতে দেয় না সুলতানা। 'তোরা দুইজন তো আবার এক রসুনের কোয়া। ছেলেকে নাহয় হাফিয বানিয়েছিস, মা শা আল্লাহ। কিন্তু শরীরের হাল দেখেছিস? ও তো বাতাসেই উড়ে যাবে! আল্লাহ কি স্বাস্থ্যের ক্ষতির জন্যে তোকে ধরবেন না?'

'ভাগ্য বলেও তো একটা কথা আছে। বাচ্চা তো আর বেলুন না যে ইচ্ছে মতো ফুলিয়ে মোটা করব।' মনটা খারাপ করে ফেলে মিতু।

'শোন, আমার মতো চেষ্টা করে দেখ। আমি তো প্রতি ঘণ্টায় বাবুকে কিছু না কিছু জোর করে খাওয়াই।' সুলতানার পরামর্শ শেষ হতে না হতেই মিতুর শুকনা ছেলেটা দৌড়ে আসে।

'আন্টি! রুমি ভাইয়া না মোবাইলে পচা জিনিস দেখে। আমাকেও দেখতে বলছে। ভাইয়া নাকি ক্লাস টু থেকে বন্ধুদের সাথে এসব দেখে। ছি ছি!' বলেই মোবাইলটা সুলতানার হাতে ধরিয়ে দেয় ও।

পিছনে থপথপ পা ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে রুমি আসে। অতিরিক্ত ওজনের জন্যেই আজ ধরা পড়ে গেল! দৌড়ে পারল না। সুলতানার চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেছে! কষে পিঠে দুই ঘা বসিয়ে দিল, 'হতচ্ছাড়া! তোর খালাতো ভাই ৭ বছর বয়সে ঘরে নামাযের ইমামতি করে, আর তুই দুধ-কলা খেয়ে কালসাপ হচ্ছিস। দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে!'

চোখের পানি আটকাতে পারছে না সুলতানা। ১৬ বছর বয়সেই এই অবস্থা! কখনো জানতেও পারেনি ক্লাস টু থেকেই চলছে এসব। ওদিকে হাফসা আর মিতুর ছেলে! একেকজন যেন স্বর্ণের টুকরা। আর ভাবতে পারে না সে। আজ মনে হচ্ছে নিজের সংসারটা স্রেফ মানুষ মোটাতাজা করবার খামার!

প্রকৃত সম্পদ

সূর্যোদয় হয়নি এখনো। জায়নামাযে বসেই কুরআন তিলাওয়াত করছেন ফাতিমা। নিয়মিত পড়ার অভ্যাসটা ধরে রাখার চেষ্টা তার। প্রতিদিন অন্তত এক পাতা কুরআন তিলাওয়াত। সাথে তর্জমা, তাফসির। এই রুটিনের ব্যত্যয় হয় না। আজও হয়নি।

ওদিকে রান্নাঘরে চলছে সকালের নাশতার জোর প্রস্তুতি। দুইজন মেয়ে ঘরের সব কাজে সাহায্য করে তাকে। তারা নাশতার কাজে লেগে গেছে ফজরের সালাত শেষেই। তৈরি নাশতাগুলো ডেলিভারিম্যান নিয়ে যাবে।

কর্মজীবী মায়েদের জন্য এই ব্যবস্থা। সম্পদের অভাব নেই ফাতিমার, নামমাত্র মূল্যে নাশতার এই সার্ভিস চালু করেছেন। কর্মজীবী মায়েদের সুবিধা, আবার নাশতা বিক্রির টাকাগুলো সাদাকা করার মধ্য দিয়ে বহু মানুষের উপকারে আসবার সুযোগ।

ফাতিমা কোনোদিন ভাবেননি এমন জীবন যাপন করবেন। আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন। ননদ রাবেয়া আর তার কিশোরী মেয়ে খাদিজা অনেক বড় উপকার করেছে ফাতিমার।

প্রথম প্রথম রাবেয়াকে তো তার পাগলাটেই মনে হতো। যেকোনো মহিলাদের অনুষ্ঠানে সে চলে যেত ইসলামি বই বা রেকর্ডিং নিয়ে। তার দাওয়াহর আন্তরিকতায় অমুসলিম কয়েকজন মুসলিমও হয়েছে। খুব অবাক লেগেছিল এ খবর পাওয়ার পর।

খাদিজাও ঠিক যেন মায়ের প্রতিচ্ছবি। কৈশোরের বাজে অভ্যাসগুলো তাকে ছুঁতে পারেনি। ফোনে বান্ধবীদের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করে না সে। বরং সুযোগ

পেলেই আত্মীয়দের বাসায় যায়। আত্মীয়তার হক রক্ষা হয়। সেইসাথে দাওয়াহর কাজও। এভাবেই ফাতিমার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিল খাদিজা। মন খুলে দুআ করলে কি না হয়! খাদিজার আহ্বানে হৃদয়ের গহীন থেকে আল্লাহকে ডেকেছিল ফাতিমা। আল্লাহ তাকে দ্বীনের খিদমতে কবুল করে নিয়েছেন। আল-হামদু লিল্লাহ! খাদিজার কথা মনে হলেই তাই হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দুআ আসে ফাতিমার। আহ! মা-বাবার চক্ষু শীতলকারী সন্তান। এই বয়সেই অবাক করা ধীর-স্থির সালাত তার। মোরগের মতো মাটিতে ঠোকর মেরে নয়, শান্ত হয়ে সিজদায় পড়ে রয় মেয়েটা। দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়, হৃদয় প্রশান্ত হয়।

রেহাল-সহ কুরআন রেখে উঠে পড়েন ফাতিমা। নোটবুক নিয়ে টেবিলে বসেন। আজকের তালিম ক্লাসে যা যা বলবেন তার নোট করা চাই। প্রতি সপ্তাহে বাসায় তালিম হয়। সেই উপলক্ষ্যে বই সংগ্রহ করে রাখেন আগে থেকেই। তালিমে আসা বোনদের মাঝে বিলি করেন। ফাতিমা ভালোমতোই জানেন, এসবই সম্পদ হিসেবে জমা হচ্ছে; যা কিছু অর্থকড়ি জমা আছে, তা নয়।

জীবনীশক্তি

ভাড়া মিটিয়ে তড়িঘড়ি করে রিকশা থেকে নামলাম। আজ একটু দেরি হয়ে গেছে স্কুলে আসতে। ফজরের পর মা একটা বায়োডাটা দেখতে বললেন। সম্বন্ধটা এনেছে আমার খালা।

কোনোমতে বায়োডাটায় চোখ বুলিয়ে কাজ সারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মায়ের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কি এতই সহজ? তার মুখে পাত্রসম্পর্কে এ-কথা সে-কথা শুনতে শুনতে কখন যে সাতটা বেজে গেছে খেয়ালই করিনি। এরপর দ্রুত রেডি হয়ে স্কুলযাত্রা।

বেশিদিন হয়নি স্কুলে জয়েন করেছি। শিক্ষকতা পেশার প্রতি বরাবরই আমার ভালো লাগা কাজ করত। মা-বাবার পর শিক্ষকরাই একটা প্রজন্ম গড়ে দিতে পারে। কলেজে পড়ার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি এ পেশাতেই আসব। প্রস্তুতিও সেভাবেই নিচ্ছিলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করতাম যেন শিক্ষিকা হওয়ার আগে আমার মৃত্যু না হয়।

আল্লাহ আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। স্কুলে জয়েন করেই উৎসাহের সাথে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া শুরু করলাম। ছাত্রীদের ইসলাম সম্পর্কে জানানো, দেওয়াল পত্রিকা বের করা, মেলার আয়োজন—আরও কত কী! আমার সহকর্মীরা হাসত। বলত, 'বিয়েটা হোক, তারপর দেখা যাবে! স্বামী সংসার হয়ে যাওয়ার পর এত উদ্যোগ, এত পরিকল্পনা কোথায় ভেসে যাবে!'

তাদের কথায় বুঝতাম যা করার আমাকেই করতে হবে। কারও সাহায্য সহযোগিতার আশায় গুড়ে বালি। উল্টো নেতিবাচক কথায় মনোবল ভেঙে যাবে।

এতদিনে একা একাই অনেক প্রজেক্ট দাঁড় করিয়ে ফেলেছি আল্লাহর অনুগ্রহে। তবু অস্বীকার করার জো নেই, কলিগদের কথায় বিয়ে নিয়ে মনের মাঝে ভয় ঢুকে গেছে। বিয়ের পর হয়তো আমি আর দাওয়াতি কাজ করতে পারব না। হয়তো আমাকে এই চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হবে পরিবারের দেখভালের জন্য। পরিবারের দেখাশোনা করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর সম্মানজনক কাজ, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তবু দ্বিধা কাজ করে মনে।

বিয়ে নিয়ে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে টিচার্স রুমের দিকে এগোচ্ছিলাম। তখনই দেখা হলো শাহিদা আপার সাথে। আপার হাতে মাঝারি সাইজের একটা বক্স। আমার উৎসুক দৃষ্টি দেখে হেসে জানালেন, আজ নাইনের ক্লাসে 'আলোর প্রতিফলন' পড়াবেন। মেয়েদের হাতে কলমে শেখানোর জন্য কিছু সরঞ্জাম এনেছেন।

শাহিদা আপা ডে শিফটে ছিলেন। আমি সকালের ক্লাস নিই। তার সাথে দেখা হয় কম, কথা হয় তার থেকেও কম। ডে শিফট ছেড়ে এসেছেন এই তো কিছুদিন আগে। এই মুহূর্তে মর্নিং শিফটে ক্লাস নিলেই তার সংসার সামলাতে সুবিধা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টা বিবেচনা করেছে।

দিন যত এগুচ্ছে শাহিদা আপার কার্যক্রম সম্পর্কে ততই জানতে পারছি। চার সন্তানের মা হয়েও কাজকর্মে এতটুকু ক্লান্তি নেই। পরিবারের হক আদায় তো করছেনই, সেইসাথে চাকরির ব্যাপারেও যথেষ্ট আন্তরিক। ক্লাসে পড়ানোর আগে সে বিষয়ে প্রচুর পড়ালেখা করে আসেন। দাওয়াতি কাজ, ছাত্রীদের শিক্ষাদান, পরিবারের দেখভাল সব সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে।

শাহিদা আপার অফুরন্ত কর্মস্পৃহা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এই মানুষটা তার কাজের মাধ্যমে আমার বাকি সহকর্মীদের মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন। বিয়ে নিয়ে মনের মাঝে দোলাচাল আর আগের মতো ভাবায় না আমাকে। তাকে দেখে বুঝতে পারি সংসার সামলেও দাওয়াতি কাজ করা সম্ভব। মানুষটাকে দেখলে মনে অসম্ভব সাহস ভর করে। তার জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে আমার মাঝেও।

একটুখানি চেষ্টা

বইটি বন্ধ করে উঠে বসল সাদিয়া। ইসলামি অনুপ্রেরণামূলক বই। সাদিয়ার প্রিয় বান্ধবী, একসময়কার সহপাঠী নওরিনের লেখা। মুখচোরা মেয়েটা দ্বীনের দাওয়াত দিতে লজ্জা অনুভব করত। সাদিয়ার বুদ্ধিতেই তার কথাগুলোকে লিখিত রূপ দিয়েছিল সে। এখন এই লাজুক মেয়েটার বই পড়ে কত মানুষই-না উপকৃত হচ্ছে!

মাঝে মাঝে অবাক লাগে সাদিয়ার। তার সহপাঠীদের মাঝে কত বৈচিত্র্য! একদিকে নওরিনের মতো মুখচোরা মেয়ে, যারা কিনা বিনয় বা লজ্জায় দাওয়াত দিতেই সংকোচবোধ করে। আবার অন্যদিকে লিমার মতো মেয়েরা।

এই তো সেদিন সাদিয়াকে ফোন দিয়ে লিমার বকাঝকা। লিমার কথায় চোখের পানি ঝরলেও সমুচিত জবাব দিয়েছিল সে। সাদিয়া প্রথম বর্ষের পর আর পড়তে পারেনি। লিমা তাদের ব্যাচের সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করা ছাত্রী। অথচ নানান অজুহাতে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে সাদিয়া তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়েই মানুষের মাঝে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় আছে। হয়তো তার চেয়েও বড় ডিগ্রিধারীদের সামনে সে সহজ সাবলীলভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। সহজভাবে কিয়ামত, মৃত্যুপরবর্তী জীবনের বর্ণনায় অনেকে ফিরে আসছে আল্লাহর দিকে।

আর এই অপরাধেই একদিন লিমা ফোন দিয়ে ঝাড়ল, 'কী যোগ্যতা আছে তোমার? অনার্সটাও তো পাস করতে পারোনি! আর আরবি ভাষাজ্ঞানের কথাই-বা কী আর বলব! তোমার কী দরকার মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেবার? তোমার চেয়ে যোগ্য মানুষের তো অভাব নেই।'

সাদিয়া নিজেকে সামলে নিয়েছিল। দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'অবশ্যই আমার চেয়ে যোগ্য মানুষের অভাব নেই। তুমি নিজে তা-ই লিমা। কিন্তু কেন তুমি দ্বীনের দাওয়াত দাও না? যেদিন অর্জিত জ্ঞান কী কাজে লাগিয়েছি তার জবাব দিতে হবে, সেদিন আমি জবাবহীন থাকতে চাই না। সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা আমি করেই যাব, যতদিন আমার রব আমাকে তাওফিক দান করছেন।'

লিমার কথা মনে পড়তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সাদিয়ার, সাথে সাথে নিজের এবং সবার হিদায়েতের দুআও করে সে। ব্যাগ গুছিয়ে বের হয়ে পড়ে, একজন আলিমার হালাকায় অংশ নেবে বলে। অনেকদিন ধরে সে অপেক্ষা করছে এই হালাকার জন্যে। সাথে সবসময় একটা নোটবুক রাখে সে। যেকোনো বক্তব্যের সারাংশ টুকে রাখে তাতে। তারপর সেই কথাগুলোই অন্য দ্বীনি বোনদের কাছে পৌঁছে দেয়, হালাকায় না এসেও উপকৃত হয় তারা।

আজ হালাকার বাইরে দেখা হয়ে গেল তাসমিয়ার সাথে। সাদিয়ার পাশের বাসায় থাকে। ইসলামকে মন থেকে ভালোবাসে মেয়েটা। ইচ্ছে থাকলেও ছোট বাচ্চাকে নিয়ে হালাকায় অংশ নিতে পারে না। আজ বাইরে দাঁড়িয়ে। জানত না যে বাচ্চা নিয়ে ঢোকা যাবে না। খুব ক্ষুদ্র পরিসরে আয়োজন। বাচ্চাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেই।

তাসমিয়ার মনটা খারাপ। আফসোস করছে খুব। তাই দেখে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সাদিয়া। নিজের ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে তাসমিয়ার ছোট ছেলে সাদকে নিয়ে বাইরে থাকতে চাইল।

'তোমার ছানাটাকে আমি রাখছি। আজকের হালাকায় তুমিই যাও। তবে শর্ত একটাই। হালাকার বক্তব্যের নোট করবে কিন্তু!'

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব তাসমিয়া কী বলবে বুঝতে পারছিল না। সাদকে নিয়ে চিন্তা নেই। সে সাদিয়া আন্টিকে খুব ভালোবাসে। তবু সংকোচ হচ্ছিল ওর। সাদিয়া ওর সংকোচের তোয়াক্কা করেনি। একরকম ঠেলেই ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মানুষের উপকারের সুযোগ বারবার আসে না। যখন আসে, তখন তা লুফে নিতে একটুও গড়িমসি করতে চায় না সাদিয়া।

প্রস্তুতি

শীতের দিনেও দরদর করে ঘামছেন আলতাফ সাহেব। বৃদ্ধ মাকে নিয়ে হাসপাতালে আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অসহ্য কানের ব্যথায় কাতর মা বারবার একটা কথাই বলছেন—'মহিলা ডাক্তারের কাছে যাব। পুরুষ মানুষকে কান দেখাব না কিছুতেই!'

আলতাফ তন্ন তন্ন করে নারী 'নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ' খুঁজেছেন। কোথাও পাননি।

মা তার জবাবদিহিতার ব্যাপারে তীব্র সচেতন। যখন জানলেন মহিলা ডাক্তার নেই, তখনই পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে সম্মত হলেন। তার আগ পর্যন্ত কানের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ব্যথার কাছে নতি স্বীকার করেননি।

ভদ্রমহিলার বয়স আশির ওপরে। এই বয়সেও নিকাব করেন। ডাক্তারের কাছে মুখ ঢেকেই কানটা খুলে দিয়েছেন সন্তর্পণে।

মধ্যবয়স্ক ডাক্তার অভিভূত। কত রোগী আসে, না চাইতেই হিজাবের বেশ খানিকটা সরিয়ে ফেলে। আর এই বৃদ্ধা কত সচেতন!

'মা, কানে কবে থেকে ব্যথা?' মহিলা রোগীদের তিনি মা বলেই সম্বোধন করেন। এতে ডাক্তারের প্রতি তাদের আস্থা তৈরি হয়।

বৃদ্ধার সাথে কিছু আলাপচারিতার পর তিনি বললেন, 'আপনি আমার মায়ের মতন, মুখটা কি একটু খোলা যায়? আপনাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে পারতাম।'

আশি ঊর্ধ্ব বৃদ্ধা এক অদ্ভুত দৃঢ়তায় জবাব দিলেন, ‘আপনি শুধু আমার কানটি পরীক্ষা করে দেখুন, আমি সেটা আপনাকে খুলে দিয়েছি।’

ডাক্তার আবারও অবাক হলেন। আল্লাহর অনুগত বান্দারা যেন এমনই হন। সমস্ত আসমানি সিদ্ধান্ত বুকভরা বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়ে মেনে নিতে তাদের এতটুকু কষ্ট হয় না!

☆☆☆

শুক্রবার বিকেল বেলা। মহিমান্বিত এক ক্ষণ। দুআ কবুলের সময়। এই সময়টাতে মেয়েটি হাতে কোনো কাজ রাখে না। মশগুল থাকে আল্লাহর যিকিরে। প্রাণভরে মনের অব্যক্ত চাওয়াগুলো বলতে থাকে পরম করুণাময়ের নিকট।

গতকাল এক প্রাক্তন সহপাঠী ফোন করেছিল। স্কুলের আর সবার ইচ্ছে তারা শুক্রবার বিকেলে কোথাও দেখা করবে। মেয়েটি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। সে জানে না, আগামী সপ্তাহে এই দিনটি আবার পাবে কি না। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার চিন্তায় সাময়িক আনন্দ-উল্লাস ত্যাগ করতে প্রস্তুত সে। কোনো সুযোগই হারাতে চায় না। সময়টা ব্যয় করতে চায় আল্লাহর নৈকট্য লাভে।

☆☆☆

ভদ্রমহিলার তিন পুত্রবধূ। তিনজনই শিক্ষিকা, দ্বীনের দাঈ। দাওয়াতি কাজে যখন তারা ব্যস্ত থাকে, তিনি তখন নাতি-নাতনিদের দেখেশুনে রাখেন। তাই নিয়ে প্রতিবেশীদের নানান কথা। তার অবশ্য এসবে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলেন, ‘আমার পুত্রবধূরা আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকে। আমি তো মনে করি, তাদের এই মহান উদ্যোগে আমার সাহায্য করা উচিত। একটু রান্নাবান্না, নাতি-নাতনিকে দেখে রাখায় যদি ওরা দাওয়াতি কাজে সময় পায়; আমি কেন তা করব না, বলুন তো? আমিই তাদের বেশি করে ইসলামি তালিম দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করি। দ্বীনের দাওয়াতে কখনো আলসেমি করলে, তাদের বকাবকি পর্যন্ত করি।’

হিসেব কায়েমের দিনটাকে সহজ করতে কী ভীষণ চেষ্টা তার!

☆☆☆

ভার্সিটির বাসটা জ্যামে পড়েছে। চারদিকে হইচই। সবাই গল্পের পসরা সাজিয়ে বসেছে যেন। কেবল একটা মেয়ে একদম চুপচাপ। নাহ, চুপচাপ বললে ভুল হবে। তার জিহ্বা ব্যস্ত আছে আল্লাহর স্মরণে। যখনই সে সময় পায়, রবের যিকিরে মগ্ন হয়ে পড়ে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম—কত ছোট দুটি বাক্য, অথচ ওজনে কত ভারী, আল্লাহর নিকট কতই-না প্রিয়!

রবের প্রশংসা আর ক্ষমাপ্রার্থনায় কেটে যায় তার অবসর। যেকোনো হালাকায় সে মনোযোগী শ্রোতা। কথা বললেও উপকারী কথা বলার চেষ্টা থাকে সর্বাত্মক। তার জিহ্বা ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে সবসময়।

☆☆☆

চার সন্তানের জননী সে। সন্তান লালনপালনের নিদারুণ ঝক্কি। তবু প্রতিরাতে তাহাজ্জুদের সালাত থেমে নেই।

মাঝে মাঝে সকালের সময়টুকু ঘুমিয়ে কাটায়। তাই নিয়ে বান্ধবীদের কত হাসাহাসি। তারা জানে না বোনটির রাতের আমল সম্পর্কে। বোনটিও খোলাসা করে নিজের ইবাদতের কথা বলতে চায় না। কে জানে কখন মনের মাঝে ইবাদতের অহংকার চলে আসে!

অবশ্য তাদের তাহাজ্জুদের গুরুত্ব মনে করিয়ে দিতেও ভোলে না সে। সুযোগ পেলেই আহ্বান করে, ফজরের অন্তত আধাঘণ্টা আগে উঠতে বলে। কারণ সে জানে, ক্ষণিকের আরামায়েশ-ত্যাগ হতে পারে পরকালে মুক্তির কারণ।

☆☆☆

ঘুমানোর আগে দশটা মিনিট একান্তে কাটায় ফাতিমা। সারা দিন কী কী করেছে মনে করার চেষ্টা করে। কোনো গুনাহ করেছে কি? অথবা ভালো কোনো কাজ—যা তার নাজাতের অসিলা হবে? ভুলগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আর নেক কাজের জন্য শোকর আদায় করে। ফাতিমা জানে, সে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত জবাবদিহিতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রতিরাতে তারই প্রস্তুতির প্রয়াস চালায় সে।

এ এমন কোনো অসাধ্য কাজ নয়। বরং ছোট্ট এ কাজটি কোনো গুনাহ করার পরপরই আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করতে সাহায্য করে তাকে।

☆☆☆

প্রতি বিকেলেই ইসলামি শিক্ষা দিতে এই বোনটি কোনো না কোনো মহিলা মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে যান। মুসলিমাদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেন সঠিক আকিদা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে। বিনিময়ে আশা করেন মহান রবের সন্তুষ্টি।

☆☆☆

রামাদান মাস। সময়টা আল্লাহর ইবাদতের, তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের। বেশি বেশি নেক আমলের শ্রেষ্ঠ সময়।

বোনটি তাই সারা দিনের কাজগুলোকে ভাগ করে নিয়েছেন। যুহরের সালাতের পর তিনি কুরআন পাঠ করেন। এরপর চলে যান রান্নাঘরে। একাই নিজের হাতে প্রচুর ইফতার তৈরি করেন একটুখানি সাওয়াবের আশায়।

তার বানানো ইফতার চলে যায় এলাকার মসজিদে। ইফতার বণ্টনের দায়িত্বটা তার স্বামী নিয়েছেন। খুঁজে খুঁজে এলাকার এমন এক মসজিদ বাছাই করেছেন যেখানে অধিকাংশ মুসল্লির বসবাস দারিদ্র্যের সঙ্গে ।

এক একটা দিন যায়, বোনটির সাওয়াবের পাল্লা ভারী হতে থাকে। তার অনুপ্রেরণা তো ওই হাদিসটি, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> *যে ব্যক্তি একজন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে, সে ওই সিয়াম পালনকারীর সমান সাওয়াব অর্জন করবে। আর এতে করে সিয়াম পালনকারীর সাওয়াবও কোনো অংশে কমে যাবে না।*[১]

[১] *জামি তিরমিযি* : ৮০৭, হাদিসটি সহিহ

☆☆☆

বিকেল হলেই কায়দা হাতে বসে পড়ে ফারহানা। খাদেমা মেয়েটাকে কুরআন পড়া শেখায়। মেয়েটারও চোখেমুখে সীমাহীন আগ্রহ। আগে সে ইসলামের হুকুম সম্পর্কে খুব কমই জানত। ফারহানার বাড়িতে কাজ করতে আসার পর থেকে টুকটাক শিখে নিচ্ছে।

ইসলামের নির্দেশ মেনে ফারহানা সদয় আচরণ করে মেয়েটার সাথে। গৃহস্থালি কাজে হাত লাগায়। চেষ্টা করে এমন পরিবেশ দিতে, যাতে করে সে তার আস্থাভাজনে পরিণত হয়।

দিনে দিনে মেয়েটার ইলম বাড়ছে। শিরক, বিদআত সম্পর্কে এখন অনেকটাই জানে সে। ফারহানার স্বপ্ন, এই মেয়েটি বাড়িতে ফিরে দ্বীনের দাঈ হবে। মানুষকে সচেতন করবে শিরকের ব্যাপারে, আহ্বান করবে রবের একত্ববাদে।

অল্প একটু সময়, আর সহমর্মিতাকে পুঁজি করে ফারহানা এগিয়ে চলছে দ্বিতীয় জীবনের দিকে। হয়তো এর বিনিময়েই রব তার হিসেব সহজ করে দেবেন!

নিআমতের কদর

দুপুরে চোখটা একটু বুজে এসেছিল। সে সময় রিনিতার ফোন। একবার মনে হলো কল ধরব না। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল রফিকের দেওয়া উপদেশের কথা।

তখন মাত্র বিয়ের এক সপ্তাহ পার হয়েছে। দুজন দুজনকে চিনছি, জানছি। সে সময় রফিক বলেছিল, 'হৃদি, তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলো। ভালো বক্তাদের কেউ কেউ কেবল বলেই যেতে চায়, শুনতে চায় না। আমার মনে হয় তুমি এর ব্যতিক্রম। তুমি যেমন ভালো বক্তা, তেমনই ভালো শ্রোতা। আল্লাহ যেন তোমার এই গুণে বারাকাহ দেন।'

সত্যি বলতে নিজের এই গুণটার কথা আমার জানা ছিল না। রফিক না বললে হয়তো খেয়ালও করতাম না। ভেবেছিলাম, স্ত্রীর প্রশংসা করা সুন্নাহ, তাই বুঝি সে এভাবে বলছে। কিন্তু খানিক বাদেই ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। রফিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহর দেওয়া এই গুণটা আমি দ্বীনের কাজে লাগাচ্ছি কি না।

কোনো জবাব দিতে পারিনি। এই গুণ কীভাবে দ্বীনের কাজে আসবে, সেটাও জানা ছিল না আমার। শেষে ও নিজে থেকেই আমাকে কিছু উপদেশ দিল। আমাকে বোঝাল, চাইলেই আমি সুন্দর ভাষায় মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি। মানুষের সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে তাদের সুপরামর্শ দিতে পারি।

মোটকথা একজন মুসলিমাহ হিসেবে কোনো-না-কোনোভাবে দ্বীনের পথে আমাকে অবদান রাখতেই হবে। সেদিন থেকেই ভাবনা শুরু। আসলেই তো আলাপ জমানো আমার স্বভাব। এই স্বভাবকে দ্বীনের কাজে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু করলাম।

রিনিতা রফিকের মামাতো বোন। পারিবারিক একটা অনুষ্ঠানে ওর সাথে পরিচয়। মেয়েটার দ্বীনের বুঝ কম হলেও আচার ব্যবহারে ভীষণ অমায়িক। ওকে দেখলে একটা কথাই মনে হয়—এত সুন্দর যার ব্যবহার, দ্বীনের দাওয়াত পেলে সে না জানি কতটা যত্নে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে। এই ভাবনা থেকেই এক মাস ধরে তার সাথে যোগাযোগ রাখছি। ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি তার ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। জানি না কতখানি সফল হলাম। তবে ওর পরিবর্তন হচ্ছে, এটুকু টের পাই।

আজ তাই অসময়ে ফোন এলেও ধরাটাই সমুচিত মনে হচ্ছিল। ফোনটা রিসিভ করে সালাম দিলাম।

ওপাশ থেকে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে সালামের জবাব এলো।

অনেক কথা হলো ওর সাথে। মেয়েটা সুখে নেই। একটা হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল মেয়ে বুকের ভেতর কষ্ট চেপে সবার সাথে ভালো থাকার অভিনয় করে যাচ্ছে। ওকে মনে করিয়ে দিলাম দুনিয়াটা আমাদের জন্য পরীক্ষাক্ষেত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বললাম। হাসিমুখে কী ভীষণ কঠিন সব পরীক্ষা দিয়ে গেছেন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে গেছেন। অথচ তিনি বিশ্বাসীদের নেতা, বিশ্বনবি।

রিনিতাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকার পরামর্শ দিলাম। একমাত্র তাঁর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়। আরও বললাম রাসুলের জন্য দরূদ পড়তে।

এক মাস পরের কথা। গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। কালবৈশাখি ঝড়ে লণ্ডভণ্ড আমাদের ছোট্ট গ্রামটা। দরিদ্র মানুষগুলো কী ভয়াবহ মানবেতর জীবন যাপন করছে না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

সাধ অনেক, সাধ্য কম। গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বললাম। নিজের সাধ্যের মধ্যেই চেষ্টা করলাম যাতে অন্তত কিছু পরিবার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে। প্রতিশ্রুতি দিলাম শহরে ফিরে আর্থিক সহায়তাদানের ব্যবস্থা করব, ইন শা আল্লাহ।

বাসায় ফিরেছি জানতে পেরেই রিনিতা ফোন দিয়েছিল। দেখা করতে চায় আমার সাথে। চলে আসতে বললাম যেকোনো সময়। সেও দেরি করেনি এক মুহূর্ত। আজই চলে এসেছে।

এতদিন পর রিনিতাকে দেখে চমকে উঠলাম আমি। খুশিতে মনটা ভরে গেল। মেয়েটা হিজাব পরা ধরেছে। লাজুক হাসি দিয়ে বলছে, এখন ওর মন খারাপ হলেই

যিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনো-বা নফল সালাতে দাঁড়িয়ে যায়।

আল্লাহর দরবারে কী বলে শুকরিয়া জানাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিস্ময়ের আরও কিছু বাকি ছিল। রিনিতা হাতে বানানো কিছু বুকমার্ক দিল আমাকে। সেসবে সুন্দর কিছু দুআ আর যিকির লেখা।

'জানো আপু, মন খারাপ হলেই রঙিন কলম আর কাগজ নিয়ে বসে যেতাম। দুআগুলো দিয়ে বুকমার্ক বানাতে বানাতে কখন যে অন্তর ঠান্ডা হয়ে যেত, টেরই পেতাম না!'

রিনিতার মুখে প্রশান্তির হাসি। হৃদয়-ছোঁয়া হাসি। সমস্ত প্রশংসা সেই রবের, যিনি অস্থির হৃদয়ে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেন, কষ্টের জীবনে বুলিয়ে দেন স্বস্তির পরশ।

ওপারের সঞ্চয়

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। সূর্যের লালচে আভায় আকাশে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা। এ সময়টায় আয়িশা ছেলেবেলার ঘ্রাণ পায়। মনে পড়ে যায় বাবা-মা আর দুই বোনের ছিমছাম সংসারের কথা। বাবা খুব তাড়া দিতেন, 'খাদিজা, আয়িশা, দ্রুত দরজা জানালা বন্ধ করো। সূর্য ডুবে যাচ্ছে।'

দুই বোনের মাঝে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। বাবা নেই আজ ১০ বছর হলো। তবু যেন আয়িশা পড়ন্ত বিকেলে বাবার আদেশের অপেক্ষা করে। চোখ ভিজে আসে, মন কেমন করে। একদিনও এর ব্যত্যয় হয় না। অতঃপর চোখটা মুছে সব জানালা কপাট বন্ধ করে।

তিন সন্তানের জননী আয়িশা। সংসার সামলে, চাকরি করে প্রতিটা দিন মাকে দেখে আসা সম্ভব হয় না। ফোনে খোঁজ খবর, ছুটির দিনে মায়ের কাছে যাওয়া, আর দূর থেকে দুআ করা। যতটুকু পারা যায় আর কি।

বড়বোন খাদিজা মাকে তার কাছে নিয়ে রেখেছে। এই এক স্বস্তির জায়গা। দুই বোন ভাগাভাগি করে নিয়েছে মায়ের দায়িত্ব। খাদিজা গৃহিণী। মাকে দেখে রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ তার জন্য।

ওদিকে আয়িশার চেষ্টাটা অন্যরকম। প্রতিমাসে বেতনের টাকাটা সে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নেয়। একভাগ বাবার উদ্দেশ্যে সাদাকা করে দেয়। যতদিন সামর্থ্য আছে, বাবার আমলের খাতা ভারী করতে এটুকু চেষ্টা আয়িশা করেই যাবে। আরেকটা ভাগ থাকে মায়ের জন্য। বিধবা মা বড্ড লাজুক। কখনো মুখ ফুটে বলে না তার

কী লাগবে। আয়িশা বেতনটা পেলেই বোনের বাড়িতে চলে যায়। তার আগে জেনে নেয় মায়ের কী খেতে মন চাইছে। মা বলে তো বলে না। অগত্যা কিছু একটা রেঁধে মায়ের সামনে হাজির হয়ে যায় সে। এরপর বোন খাদিজার সাথে চলে খুনশুটি।

‘মা আমাকে মুখ ফুটে বলতেই চায় না কী খাবে। আর তোকে ঠিকই বলে! তুই যে তার অতি আদরের কন্যা, তা আর বুঝতে বাকি নেই।’

খাদিজার কপট রাগ আরও উস্কে দেয় আয়িশা, ‘কেন রে আপু, প্রতিদিন সেবাযত্ন করে যে পুরস্কার বাগিয়ে নিচ্ছিস, তাতে বুঝি মন ভরে না? সব সাওয়াব তোরই চাই, আমাকে ভাগ বসাতে দিবি না?’

মা বাধা দেবার আগ পর্যন্ত দুই বোনের এই মধুর ঝগড়া চলতেই থাকে। ফিরে যাবার সময় আয়িশা কিছু টাকা মায়ের হাতে গুঁজে দেয়। নাতি-নাতনিদের জন্য খরচের শখ হলে যেন চাইতে না হয়। মা সংকোচে বলে, ‘আমার টাকার কী দরকার বল তো?’

আয়িশা হাসে। দরকারটা আসলে ওর। এই খরচটা সে ওপারের জন্য জমা রাখছে।

আয়িশা আর খাদিজা দুজনেই জানে, সন্তানের প্রতি মা-বাবার পাহাড়সম অধিকার। ওই হাদিসটা তারা কখনোই ভুলতে চায় না, যেখানে এক ব্যক্তি জিহাদে অংশ নিতে চেয়েছিল। আর তার মা ছিল জীবিত। তখন আল্লাহর রাসুল তাকে বলেন, ‘তবে, তুমি নিজেকে তাদের (মা-বাবার) সেবায় নিয়োজিত করো।’[১]

দুই বোন, দুই জীবন। সংসারে তারা আবির্ভূত হয়েছে ভিন্নরকম চরিত্রে। তবু একটা জায়গায় তারা একদম এক। দুজনেই নিজেদের জীবন সাজিয়েছে মা-বাবাকে ঘিরে।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩০০৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৪৯

যাত্রার মধ্যস্থলে

মেয়ে তোমার যাত্রা শুরু হয়েছে এক অনন্ত পথে। দ্বীনকে অন্তরে ধারণ করতে তোমার প্রচেষ্টা নিরন্তর। গন্তব্যে পৌঁছাবার আগে যাত্রার মধ্যস্থলে একটু থামবে কি? শুনবে কি কিছু কথা? তোমায় যে কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ছিল!

তুমি কি জানো দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু কী? আল্লাহর উদ্দেশ্যে যেকোনো কাজে আন্তরিক নিয়তই হলো দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু। এটিই নবিদের দেওয়া বার্তার মূল চাবিকাঠি। তুমি কি শোনোনি আল্লাহ বলেছেন—

তাদের এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে (শিরক করা থেকে বিরত থাকবে)।[১]

আমরা বড় কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিচ্ছি। আমাদের যে তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে!

এ পথে আছে লোকদেখানো আমলের ভয়, আছে অহংকারের ভয়। রিয়ার চোরাবালিতে পড়ে কেউ কেউ ইবাদত আর নেক আমল জানিয়ে দিতে চাইবে সকলকে। তারা ভালো কাজ করবে নিজেকে জাহির করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের জন্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নয়। রিয়া তাদের অন্তরকে বশীভূত

---

[১] সুরা বাইয়্যিনা, আয়াত : ৫

করে ফেলবে খুব গোপনে। অথচ এই রিয়া বা লোকদেখানো আমল দাজ্জালের থেকেও ভয়ংকর। আবু সায়িদ আল-খুদরি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

'আমি কি তোমাদের এমন কিছুর কথা বলব, যেটাকে আমি দাজ্জালের আগমনের থেকেও বেশি ভয় করি?'

তারা বলল, 'অবশ্যই, আল্লাহর রাসুল!'

জবাবে তিনি বললেন, 'গোপন শিরক (অর্থাৎ রিয়া)।'[১]

তোমাকে বলছি মেয়ে, নিজেদের নেক আমলগুলো যতটা পারো লুকিয়ে রেখো। নিয়ত পবিত্র রাখতে এটুকু তোমায় করতেই হবে। পবিত্র নিয়ত এমনই মহিমান্বিত, যা তোমার নেক আমল, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যবোধকে দেবে পূর্ণতা। হয়তো তুমি ভাবছ সামান্য এক আমল, তবু হতে পারে নিয়তের গুণে আল্লাহ বহুগুণে পুরস্কার দেবেন।

তোমায় আমি স্মরণ করিয়ে দেবো ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর উল্লেখ করা সেই হাদিসটি। যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছিলেন এক ব্যভিচারিণী নারীর কথা, যাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। পথে যেতে সে এক পিপাসা-কাতর কুকুরের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। মরণাপন্ন কুকুরটির জন্য সেই নারী নিজের জুতোয় করে পানি নিয়ে আসে। এর বিনিময়ে সে পায় তার রবের ক্ষমা।

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনু তাইমিয়া বলেছিলেন পবিত্র নিয়তের কথা। অন্তরে আল্লাহর প্রতি পবিত্র নিয়ত নিয়ে কুকুরটিকে পানি দিয়েছিল সে। এই কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। সব ব্যভিচারিণীই তো কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা পেয়ে যাবে না! বরং ক্ষমা নির্ভরশীল শুদ্ধ বিশ্বাস আর আন্তরিক নিয়তের ওপর। তাই তো যে ব্যক্তির নিয়তে গোঁজামিল, যে ব্যক্তি শুদ্ধ নিয়তে ইবাদতে শামিল হয়নি, সে কোনো নেকির ভাগীদার হবে না। বরং তার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ ফল। হোক না সে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিরাট যোদ্ধা, অবিশুদ্ধ নিয়তের পরিণাম তাকে ভোগ করতেই হবে!

---

[১] *সুনানু ইবনু মাজাহ* : ৩৪০৮; হাদিসটি হাসান, গ্রহণযোগ্য

কুরআনে মহামহিম আল্লাহ বলেছেন—

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?[১]

ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো সবচেয়ে আন্তরিক ও শুদ্ধ আমলের কথা; তিনি বললেন, 'যদি আমলটির নিয়ত ঠিক থাকে কিন্তু পদ্ধতি ঠিক না হয় তাহলে সেটা বাতিল হয়ে যাবে। আবার আমলটির নিয়ম শুদ্ধ, কিন্তু নিয়ত সঠিক হলো না তাহলেও সেটা বাতিল হয়ে যাবে। আমলটির নিয়ত এবং পদ্ধতি উভয়ই শুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পদ্ধতিতে কৃত নেক আমল হলো, সুন্নাহকে মেনে চলা।' অতঃপর তিনি শোনালেন এই আয়াতটি—

সুতরাং, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।[২]

পরম করুণাময়ের কাছে চাইছি, তিনি যেন জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে তোমায় রক্ষা করেন। শয়তানের ধোঁকায় যেন তোমার নেক আমল ধূলিসাৎ না হয়ে যায়।

মেয়ে, তুমি জিহ্বাকে সংযত রাখো। গীবত, অপবাদ আর মিথ্যায় যেন তোমার জীবন ছেয়ে না যায়। সকালে নেকির পাহাড় গড়ে রাত পেরুনোর আগেই যেন তা ধসে না পড়ে। তোমার কামাই করা সাওয়াব হারিয়ে ফেলো না।

সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা—'তোমরা কি জানো, সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি কে?'

সাহাবা রাযিয়াল্লাহ আনহুম বললেন, 'নিঃস্ব হলো এমন ব্যক্তি যার কাছে কোনো দিরহাম বা সম্পদ নেই।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক নিঃস্ব, যে বিচার দিবসে তার কৃত

[১] সুরা কলম, আয়াত : ২

[২] সুরা কাহাফ, আয়াত : ১১০

সালাত, সিয়াম, যাকাত নিয়ে হাজির হবে। অতঃপর, সে যাদের অভিশাপ দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে বা মারধর করেছে, তারা একে একে তার কাছে আসতে থাকবে। আর তখন ওই ব্যক্তিকে নিজের নেক আমল থেকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। সব নেক আমল দেওয়ার পরও যদি পাওনা পূরণ না হয়, তবে পাওনাদার ব্যক্তির গুনাহ হস্তান্তর হয়ে যাবে এই ব্যক্তির নিকট। আর এরপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের আগুনে।'[১]

[১] *সহিহ মুসলিম : ২৫৮১*

দুআর জননী

'মামণি, তাড়াতাড়ি করো। খালামণি গল্প বলা শুরু করে দেবে তো!'

অস্থির গলায় মাকে তাড়া দিচ্ছে আব্দুল্লাহ। মা মাত্র আসরের সালাত শেষ করে উঠেছেন। এখন তার দায়িত্ব ছেলেকে নিচতলায় সাফিয়ার বাসায় পৌঁছে দেওয়া। সাফিয়াকে তিনি মজা করে 'দুআর জননী' ডাকেন।

এপার্টমেন্টের ছোট বাচ্চারা সাফিয়া বলতে পাগল। প্রতিদিন বিকেলে তার বাড়িতে বাচ্চাদের আসর বসে। সাফিয়া অনেক দরদ নিয়ে বাচ্চাদের বিভিন্ন দুআ শেখায়। এই তো সেদিন আব্দুল্লাহর বাবা খেলনা আনতে ভুলে গেল। ছেলেটা বড় আশা নিয়ে বসে ছিল কখন বাবা অফিস থেকে ফিরবে। বাবাকে খালি হাতে দেখে চোখে পানি চলে এসেছে, তবু দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে সবরের দুআ করছে। মা হয়ে সেই দিনটি ভুলবার নয়। আব্দুল্লাহর মায়ের মন ভরে শুধুই দুআ এসেছে সাফিয়ার জন্য।

প্রাণচঞ্চল এই তরুণী মেয়েটা একটা স্কুলে পড়ায়। তার ধ্যানজ্ঞান স্বপ্ন সব বাচ্চাদের ঘিরে। সবসময় চেষ্টা করে যেকোনো মূল্যে তাদের দ্বীনের পথে ডাকতে। ছোট ছোট কাজ করে হলেও। হয়তো স্কুলের প্রশ্নপত্রে ফাঁকা জায়গা রয়ে গেছে, সাফিয়া সেখানে ছোট একটা হাদিস লিখে দেয়। উদ্দেশ্য একটাই—বাচ্চারা যেন হাদিসটা শেখে।

বিকেল বেলা এপার্টমেন্টের সব বাচ্চার দাওয়াত তার বাসায়। সাফিয়া তাদের সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুদের গল্প শোনায়। নবি-রাসুলদের গল্প শোনায়। আগ্রহভরে তার গল্প শোনে সবাই। শুধু গল্প বলেই ক্ষান্ত দেয় না সে। গল্পের শিক্ষাটুকু ওদের

বুঝিয়ে দেয়, গেঁথে দিতে চায় নিষ্পাপ নরম মনগুলোর মাঝে। আসরশেষে বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দেয় চকলেট, অবশ্যই মায়েদের অনুমতি নিয়ে।

একদিন বিকেলের আসরে মনটা খারাপ হয়ে গেল ভীষণ। ছোট্ট ফাতিমা জানিয়েছে তার গানের টিচার আসবে আগামীকাল থেকে, সে আর এই আসরে আসতে পারবে না। সাফিয়া জানে না এর সমাধান কী। তবু চেষ্টা করে ফাতিমার মায়ের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে। তাকে একটা বই উপহার দেয় সে। বইটি ছিল গানবাজনা সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান নিয়ে। তিন-চার দিন পরই ভদ্রমহিলা ফাতিমাকে নিয়ে আসরে হাজির। আল্লাহ সাফিয়ার চেষ্টা কবুল করেছেন। তার অসিলায় ফাতিমার মায়ের বোধোদয় হয়েছে। বইটি পড়ামাত্র গানের শিক্ষক বাদ দিয়েছেন তিনি।

আনন্দে চোখে জল চলে আসে সাফিয়ার। রাতারাতি কারও বোধোদয় হবে এমনটা সে আশা করেনি। সে শুধু চেষ্টা করে গেছে। তার সেই চেষ্টার ফল এত সুমিষ্ট হবে, কে জানত!

সবর

প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দ্বীনের পথে দাওয়াতকারী ব্যক্তি, দাওয়াত গ্রহণকারী সকল ব্যক্তির কৃত সাওয়াবের সমান সাওয়াব অর্জন করবে। এতে করে দাওয়াত গ্রহণকারীদের প্রাপ্য সাওয়াব কমানো হবে না। ঠিক একইভাবে, পাপকাজের জন্য কাউকে আহ্বানকারী ব্যক্তিও সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক পাপীর সমতুল্য শাস্তির অংশীদার হবে। আর এতে করে তাদের নিজেদের পাপের বোঝাও কোনো অংশে কমে যাবে না।'[১]

একটা বই নেড়েচেড়ে দেখছিল খাদিজা। হঠাৎ হাদিসটির দিকে দৃষ্টি আটকে গেল। ঠিক এই কথাগুলোই ইউসুফ গতকাল বলছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় ইউসুফ বেশ বদলে গেছে। দিনের পর দিন নানানভাবে চেষ্টা করে গেছে খাদিজা। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে অশ্লীল বিনোদন ছেড়ে দিয়েছে ইউসুফ।

খাদিজার আহ্বানে কত কড়া কথা বলত সে! কত কষ্ট দিত! অথচ আজ সব ছেড়ে সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছে। দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছে। গতকাল সন্তুষ্টিচিত্তে ইউসুফ বলছিল, 'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

খাদিজা পার্থিব কিছু চায়নি, সে স্বপ্ন দেখে জান্নাতের বাগানে স্বামী-স্ত্রী একসাথে হাঁটছে। ইউসুফ মনে করিয়ে দেয় তার সব ভালো কাজের সাওয়াব খাদিজারও।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯৩

দুনিয়াতেই এত আনন্দের ভাগ পাবে, ভাবতেও পারেনি খাদিজা।

☆☆☆

'সারা দিন বাসায় করো কী, যে ঘরবাড়ি এত এলোমেলো হয়ে থাকে!'

বাসায় ঢুকতে না ঢুকতেই তারেকের খোঁটা দেওয়া শুরু হয়ে যায়। এখন আর অত সহজে মন খারাপ করে না শিমু। আল্লাহর জন্যে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করে।

সারা দিন মাইগ্রেনের ব্যথায় পড়ে ছিল সে। স্বামী হিসেবে একবার খোঁজটাও নেয়নি তারেক। বিয়ের পর থেকেই তার এই বদমেজাজ দেখছে শিমু, অথচ সবাই জানে তারা খুব সুখী দম্পতি। প্রথমদিকে কেঁদেকেটে একাকার করলেও এখন বেশ মানিয়ে নিয়েছে সে।

তারেক হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিতেই শিমু খাবার সাজিয়ে দেয় টেবিলে। মাথা ব্যথা নিয়েও কষ্ট করে দুই পদের তরকারি রান্না করে রেখেছে। গোরুর গোশত মেখে এক লোকমা মুখে দিতেই থু থু করে ফেলে দেয় তারেক।

'এত লবণ! খাওয়া যায় নাকি! রান্নার কোর্স করো একটা! তাও যদি সারা দিন অফিস করে এসে মুখে কিছু দিতে পারি!'

খাবার ছেড়ে উঠে যায় স্বামী। শিমুর শত অনুরোধেও কোনো কাজ হয় না। কাজ হবে কী করে! বাইরে বন্ধুদের সাথে খেয়ে এসেছে যে! এখন আর পেটে জায়গা নেই। এই সুযোগে রান্না নিয়ে বাজে মন্তব্য করে স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়াও হয়ে গেছে।

হতাশ শিমু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিজের রবের কাছে কষ্টের কথা জানায়। একদিন এই ধৈর্য-পরীক্ষার ফল সে পাবেই, ইন শা আল্লাহ।

☆☆☆

কাগজের ঠোঙা থেকে লাল টুকটুকে আনার বের করে আব্দুল্লাহ। জ্বরমুখে কিছুই খেতে পারছে না ছেলেটা, আসমা তাই ওষুধের সাথে আব্দুল্লাহর প্রিয় ফলটাও কিনে এনেছে।

হঠাৎ বেল বাজায় দৌড়ে দরজা খুলে দেয় আসমার বড় মেয়ে ফাতিমা। পাশের বাসার আন্টি এসেছে। মুহূর্তের মধ্যেই সারা ঘর পর্যবেক্ষণ করে ফেলেছেন তিনি।

মন্তব্য ছুড়ে দিতেও দেরি করেননি, 'বাহ! আনার কিনেছ দেখছি! ফলের যা দাম বেড়েছে! আমি তো কল্পনাও করতে পারি না এত দামি ফল কেনার কথা। নিশ্চয়ই ওদের বাবা টাকা পাঠায়? কত উদারমনা লোকটা, মা শা আল্লাহ। কেন যে সংসারটা টিকাতে পারলে না... আসলে কপালে নেই বুঝলে!'

'পুরোনো কথা থাক না, আপা! চা করে দিই?' কথা ঘুরায় আসমা।

দিনের পর দিন কৃপণ লোকটার সাথে ঘর করে গেছে। নিজের প্রয়োজন তো দূরের কথা, বাচ্চাদের জন্যেও খরচ করতে চাইত না। নানান ছুতোয় ডিভোর্স দিয়ে দিল। বাচ্চাদের ভরণপোষণের বিষয়টাও এড়িয়ে গেল। আর আসমার মোহরানা? সে তো বিয়ের রাতেই মাফ করিয়ে নিয়েছিল।

আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা ভেবে এসব কাউকে জানায় না আসমা। কী হবে ময়লা ঘেঁটে! সুন্দর ফুটফুটে দুইটা বাচ্চা আছে ওর। বাবা দায়িত্ব না নিক, বাবার প্রতি তো ওদের দায়িত্ব আছে। ওদের সামনে কখনোই বাবার দোষ বলেনি আসমা। বরং চেষ্টা করে ভালো কথা বলবার। ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গেঁথে দিতে চায় সন্তানের মনে। টেনেটুনে সংসার চালিয়ে নিচ্ছে সে। টাকা হাতে এলেই বাচ্চাদের জন্যে খরচ করে। বাবা-মা দুজনের দায়িত্বই পালন করে যাচ্ছে একার হাতে। এত বড় দায়িত্বই বা ক'জন পায়! নিশ্চয়ই আসমা বড় ভাগ্যবতী। রাব্বুল আলামিন তো কাউকেই সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা দেন না!

সুবর্ণ সুযোগ

হালাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে যাইনাব। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। এখন বাজে সাড়ে তিনটা। হালাকা চারটায় শুরু হবে। ইচ্ছে করেই একটু আগে বের হয়েছে সে। আগে ইসলামি বইয়ের দোকানে ঢু মেরে যাবে। বোনদের মাঝে বিতরণের জন্য বেশ কিছু বই কেনার ইচ্ছা। হালাকা শেষ হবে সেই মাগরিবের আযানের সময়। সেখানেই সালাত আর ইফতার সেরে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। সুন্নাহ মেনে প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার সে সিয়াম পালন করে।

জ্যামের হাবভাবে মনে হচ্ছে সারা দিন রাস্তাতেই কেটে যাবে। স্মার্টফোনটা হাতে নিয়ে দুআর অ্যাপ খোলে যাইনাব। সেদিন হালাকায় ইয়াসমিন আপু বলছিল, অস্থায়ী বড় আমলের চাইতে ছোট কিন্তু নিয়মিত আমলগুলো আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সেই থেকে যাইনাব ঠিক করেছে সপ্তাহে একটা হলেও মাসনুন দুআ মুখস্থ করবে।

দুআর অ্যাপটা চমৎকার। প্রতিদিন বিভিন্ন দুআর রিমাইন্ডার আসে। আজ যেমন মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করানোর দুআ এলো। যাইনাবের মনে পড়ে গেল গত সপ্তাহের কথা। এলাকার এক বৃদ্ধা মারা গেলেন। দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে পড়ে পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল। লাশ গোসল করানোর লোক পাওয়া যাচ্ছিল না।

শেষে যাইনাবই এগিয়ে গেল। চারদিকে হইচই, এত বড় ঘরের মেয়ে লাশ ধোয়াবে! এ কেমন কথা! লোকের কথা কানে তোলেনি। সে তো চায় তার মৃত্যুতেও সুন্দর করে কেউ গোসল করাক। চোখের সামনে এক মুসলিমার লাশ পড়ে রইবে গোসলের অপেক্ষায়—এমনটা মানতে কষ্ট হয়!

ক'দিন ধরেই মৃত্যুর ভাবনা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে যাইনাবকে। বাড়ির পাশেই মসজিদে লাশ গোসল করানো থেকে শুরু করে দাফনের সমস্ত ব্যবস্থা আছে। যাইনাব সিদ্ধান্ত নিল কাফনের কাপড় পাঠাবে সেখানে। কখনো-বা দাফনের কাজে আর্থিক সাহায্য। তাতে যদি নিজের মৃত্যুপরবর্তী জীবনটা সহজ হয়!

পরম করুণাময়ের অশেষ দয়ায় সম্পদের অভাব নেই যাইনাবের। হাশরের দিন এই সম্পদের হিসেব দিতে হবে। হিসেবগ্রহণের দিনটাকে সহজ করতে আপ্রাণ চেষ্টা তার। একদিন হালাকায় একটা হাদিস জেনেছিল সে—'যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী একজনকে সাহায্য করল, সে যেন নিজেই জিহাদে অংশগ্রহণ করার সম্মান পেল।'[১]

এরপর জিহাদে সাহায্যকারী দাতা সংস্থা খুঁজে বের করে সেখানেও দান করেছে যাইনাব।

অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করে কেন এত সাদামাটা জীবন যাপন করে সে? অর্থের তো অভাব নেই তার। যাইনাব মৃদু হেসে এড়িয়ে যায়। সম্পদ সে ব্যয় করে আখিরাতের জন্য। আজ ইসলামি বইয়ের দোকানটাতেও যাচ্ছে বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে। দোকানটা প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। মালিক বলেছিল দোকান উঠিয়ে দেবে।

যাইনাব তার স্বামীর সাথে আলোচনা করে চমৎকার এক বুদ্ধি বের করেছে। ঠিক করেছে দোকান থেকে প্রচুর বই কিনে নেবে ওরা। সেইসাথে বিত্তবান যত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব আছে, তাদেরও সেখান থেকে বই কিনবার আহ্বান করবে। সবাই মিলে বই কিনে নিলে দোকানটা আর পথে বসে না।

জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে লুকিয়ে আছে রবের অবাক করা নিদর্শন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে বান্দাদের জন্য তিনি কত সুন্দর সব সুযোগ তৈরি করে দেন! এই দোকানটা সম্পর্কে সে না-ই জানতে পারত। হয়তো বন্ধ হয়ে যেত দোকানটা। বন্ধ হয়ে যেত ইসলাম প্রচারের একটা দরজা। অথচ আল্লাহ চাইলেন তার সম্পদশালী বান্দাটা জানুক। দ্বীনের খেদমতে এই অনন্য সুযোগটা লুফে নিক। কৃতজ্ঞতায় চোখ ভিজে আসে যাইনাবের। তার রবের নিআমত অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৮৪৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৯৫

উষ্ণ দাওয়াত

'আপা এই দিকে আসেন, এই দিকে! কী লাগবে বলেন!'

অস্বস্তিতে দ্রুত পা চালাল ফারিহা। দুইপাশ থেকে দুই দোকানি ডাকাডাকি করছে। দরকার হলে ফারিহা নিজেই দোকানে ঢুকবে। কেন যেন দোকানিরা এই জিনিসটা বুঝতে চায় না। নারী কাস্টমার দেখলেই তাদের ডাকাডাকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। একটু আগেই এক মেয়ে একটা দোকানে ঢুকে গেল পাশের দোকানিকে অগ্রাহ্য করে। ব্যস! পাশের দোকানি মেয়েটাকে যা নয় তা-ই বলতে শুরু করেছে। ফারিহার নিজের চোখে দেখা। কেউ প্রতিবাদ করছে না। কেউ কেউ হাসছে তাকে হেনস্থা হতে দেখে।

বান্ধবীর বিয়ের উপহার কিনতে এসেছিল ফারিহা। বহুদিন পর মার্কেটে আসা। ঠিক করেছে বছরে দুইবারের বেশি মার্কেটে আসবে না। অহেতুক খরচ যতটা সম্ভব কমানো দরকার। এখন আর আগের মতো কেনাকাটা করে না সে। আগে সাজগোজের খুব শখ ছিল। ড্রেসিং টেবিলভরতি প্রসাধনী।

এক আপু বলেছিলেন, 'শখের পেছনে এত খরচ করছ ফারিহা! জানো, এমন মানুষও আছে যারা শখ কী জিনিস জানেই না! তিন বেলা খেতে পারলেই সুখের সাগরে ভাসে।'

আপুটার কথা শুনে খুব লজ্জা পেয়েছিল ফারিহা। তার কথার ধরনই এমন যে অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। দাওয়াতি কাজে ভীষণ কৌশলী তিনি। হয়তো কাউকে চোখের সামনে ভুল করতে দেখছেন। মানুষটা তার কাছের কেউ না। ভুল ধরিয়ে

দিলে বিব্রত হবে, অপমানবোধও করতে পারে। তখন আপুটা ওই ব্যক্তির কাছের কাউকে অনুরোধ করেন তাকে বুঝিয়ে বলতে। এতে যে ভুল করছে, সে বিব্রত হয় না; আবার নিজেকে সংশোধন করারও সুযোগ পায়।

আবার মাঝে মাঝে প্রচলিত ভুলগুলো সম্পর্কে আলিমদের প্রশ্ন লিখে পাঠান তিনি। আলিমরা তখন প্রচারমাধ্যমে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। আপুটার উদ্দেশ্য থাকে আলিমদের মাধ্যমে সবাইকে সঠিক তথ্য জানানো। ফারিহা তার বুদ্ধিমত্তায় যারপরনাই মুগ্ধ। সুযোগ পেলেই তার কাছ থেকে দাওয়াতি কাজের নানান কৌশল জেনে নেয়।

সেদিনের সেই কথা শুনে শখের পেছনে অতিরিক্ত খরচ থামিয়ে দিয়েছে ফারিহা। প্রসাধনীর জন্য বরাদ্দ টাকাটা সে এখন ব্যয় করে সাদাকার কাজে। কালেভদ্রে শপিং এ যায়। যতটুকু না খরচ করলেই নয়, ততটুকুই করে নিজের জন্যে। বান্ধবীর বিয়ে না হলে আজও শপিংয়ে আসত না।

বিয়েতে যাওয়া হবে না ফারিহার। বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করেছিল নারী-পুরুষ আলাদা বসবার ব্যবস্থা রয়েছে কি না। জানতে পারল এই বিয়েটা গতানুগতিক বিয়ের মতোই। নাচগান-বাদ্যবাজনা সবই থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এমন অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলে সে।

বিয়ের আগেই তাই বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে একটা হিজাব আর কিছু ইসলামি বই। উপহার মানুষে মানুষে ভালোবাসার সৃষ্টি করে, ছড়িয়ে দেয় উদারতার উষ্ণ প্রভাব। ঠিক যেমনটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'উপহার আদানপ্রদান করো আর একে অন্যকে ভালোবাসো।'[১]

কে জানে, হয়তো এ উপহারই হয়ে যাবে বান্ধবীর হিদায়াতের অসিলা!

[১] আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪, হাদিসটি হাসান-গ্রহণযোগ্য

স্বর্ণে গড়া উপহার

শান্তার বিয়ে। আর দশটা মেয়ের মতো হইচই আনন্দে বিয়ে হচ্ছে না ওর। যতটুকু আয়োজন না করলেই নয়, কেবল ততটুকুই।

প্রথম সংসারটা টেকেনি শান্তার। দিনের পর দিন শারীরিক মানসিক অত্যাচারে নাভিশ্বাস উঠেছিল। ডিভোর্সের পর জীবনটাকে নতুন করে চিনল সে। যা কিছু সহজ ভেবেছিল, তার সবটাই জটিল থেকে জটিলতর রূপে হাজির হলো যেন।

হার মানেনি শান্তা। নতুন করে জীবন সাজানোর স্বপ্ন দেখেছে। পরম করুণাময় চাইলে যেকোনো মুহূর্তে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। তাই যখন খালা এই সম্বন্ধটা আনল, আপত্তি করেনি শান্তা। ভদ্রলোক তিন সন্তানের বাবা। ছোট ছেলেটার জন্মের সময় তার স্ত্রী মারা গেল। এখন বাচ্চাটার বয়স মাত্র দুইমাস।

বিয়ের আগে হবু বর তাকে ভেবে দেখতে বলেছিল আরেকবার। নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছে শান্তা। সামনে আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের হাতছানি। এই মুহূর্তে সে কি সব ছেড়ে তিনটা বাচ্চা মানুষ করতে প্রস্তুত? কেন সে এত জটিল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে?

শান্তা ব্যাখ্যা করতে যায়নি অত কিছু। ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিল, ভেবে চিন্তেই সে এই বিয়েতে রাজি হয়েছে।

মনে মনে অবশ্য খুব হেসেছিল। তার অবস্থা বোঝাতে 'ডিভোর্সি' খুব ছোট্ট একটা শব্দ। অগভীরও বলা যায়। হবু বর জানে না এই ক্ষুদ্র জীবনে সে কতটা কঠিন

পথ পাড়ি দিয়েছে। রবের সন্তুষ্টির আশায় কত দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনটা শিশুকে নিজের হাতে গড়ে নিতেও সে রবের সন্তুষ্টিই আশা করে। আগের সংসারে যা হয়নি, আল্লাহ চাইলে এ সংসারে তা হতেই পারে। সে চেষ্টা করে যাবে সর্বাত্মক, বাকিটা তার রবের ইচ্ছা।

পরম করুণাময় শান্তাকে ফিরিয়ে দেননি। নতুন সংসারে না চাইতেই অনেক পেয়েছে সে। কৃতজ্ঞ বান্দার মতো সে-ও যতটা সম্ভব দেবার চেষ্টা করেছে।

বর যেন তার মা-বাবার সেবা করতে পারে, ভাইদের খেয়াল রাখতে পারে সেজন্য শান্তাই তাগাদা দেয়। বদলির চাকরিতে দু-বছর গ্রামে থাকতে হয়েছিল। গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত হবার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! তবু শান্তা অভিযোগ করেনি। বরঞ্চ সময়টাকে কাজে লাগিয়েছে গ্রামের মহিলাদের দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে।

এরপর আবার শহরে বদলি। শান্তা পরামর্শ দিল শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি বাসা নিতে। এই দুইটা বছর তার বর মা-বাবার জন্য কিছুই করতে পারেনি। ছোট ভাইয়েরা দেখভাল করেছে। কাছাকাছি বাসা হলে বরের পক্ষে বাড়িতে যাতায়াত সহজ হয়ে যায়।

বিয়ের পর নিজের পরিবারকে ভুলে যায়নি শান্তা। পাশাপাশি যতটা পারে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। বরকে নিয়ম করে মনে করিয়ে দেয় ভাইদের যেন দ্বীনের কাজে উৎসাহ দেয়। তারা কাদের সাথে মেলামেশা করছে, সেদিকেও যেন খেয়াল রাখে।

বরের পরিবারও বেশ আন্তরিক। গল্প নাটকে শাশুড়ি বউয়ের যে চিরস্থায়ী শত্রুতার চিত্র তুলে ধরা হয়, তা এখানে অনুপস্থিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে মনের হিংসা বিদ্বেষকে বিদায় জানিয়েছে সবাই।

নির্বিঘ্নে কেটে যাচ্ছিল শান্তার দিনগুলো। এরই মাঝে একদিন ননদের স্বামীর স্ট্রোক। দুইদিন আইসিইউতে থেকে ফিরে গেলেন তার রবের কাছে। একদিকে স্বামী হারাবার শোক, অন্যদিকে দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা। ননদকে দেখে শান্তার অতীত মনে পড়ে গেল। কী অসহায়, একাকী জীবন! বিধবা মেয়েটা যেন ওর আয়না হয়ে এসেছে।

বোনজামাইকে কবরে শুইয়ে ঘরে ফিরল শান্তার বর। দুঃখ কষ্ট ছাপিয়ে বোনকে নিয়ে একরাশ দুশ্চিন্তা। সেই মুহূর্তে শান্তা এলো স্বস্তি হয়ে। বরকে অনুরোধ করল বোনের সবটুকু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে।

'তুমি আমার জন্য এত কিছু কেন করো?'

বিস্ময় চাপতে পারে না শান্তার বর। মেয়েটা তার তিন সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করছে। এখন বোনের দায়িত্বটাও নিতে বলছে তাকে। মানুষ এমনও হয়!

শান্তা হাসে। সে জানে, যে নারী তার স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। যতটুকু করছে শান্তা, সব তো তার নিজেরই জন্য!

তাওহিদের ভিত

খবরের কাগজটা দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে ফারিহা। গরম সহ্য করতে পারে না সে। নিজের কাপড়ে তো হাঁসফাঁস করেই, অন্যের গায়ের বোরকাটাও মেনে নিতে কষ্ট হয় যেন। সুমাইয়ার বোরকা দেখে থাকতে না পেরে শেষে বলেই ফেলল, 'এই আপা, গরম লাগে না আপনার?'

মৃদু হাসল সুমাইয়া। খুব পরিচিত প্রশ্ন। আগেও অনেকবার শুনেছে। এমন প্রশ্নের জবাবে বেশ কৌশলী হতে হয়। ধৈর্য ধরে সুন্দর করে পর্দার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললে অনেকেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। তাই সুমাইয়া কোনো কঠিন বাক্য খরচে যায়নি। বরং মুখের হাসিটা ধরে রেখে বলেছে, 'গরম লাগে আপা। ভীষণ গরম লাগে! কিন্তু এই ফরয ইবাদতটা ছেড়ে দিলে যে জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করছে! সে আগুনের কথা ভাবলে দুনিয়ার এই গরমকে কিছুই মনে হয় না!'

ফারিহা একটু ভ্রু কুঁচকে বিব্রতভঙ্গিতে হাসে। পাশেই বসা ছিল দুই তলার শান্তা। পর্দার প্রসঙ্গ ওঠায় বেশ ভালোই হয়েছে তার জন্য। নতুন পর্দা শুরু করেছে। অনেক কিছুই অজানা। বেশ আগ্রহ নিয়ে সুমাইয়ার কাছ থেকে পর্দার নিয়মকানুন জেনে নেয় সে।

সুমাইয়া এই এলাকায় নতুন। সেদিন জানতে পারল বিকেল বেলা পাশের ফ্ল্যাটে এপার্টমেন্টের মহিলারা জড়ো হয়। গল্পে গল্পে সময় কাটায়। তখনই ঠিক করে ফেলেছিল সে-ও উপস্থিত থাকবে এই আসরে। চেষ্টা করবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে। এই এলাকায় এসে ওর একটু মন খারাপই হয়েছিল। দ্বীনি পরিবেশ নেই।

ওর বর জানিয়েছিল, খুব কম লোকই ফজরের সালাত মসজিদে আদায় করে। কষ্ট পেয়েছিল ভীষণ। সেজন্যই বিকেলের আসরে যাওয়া। প্রতিদিন একটু একটু করে দ্বীনের কথা বলার চেষ্টা করে সুমাইয়া। সবাই যে খুব গুরুত্ব দেয় তা না। অতি আধুনিক মেয়েদের ভিড়ে ওর বেশভূষা একটু অস্বাভাবিকই বলা চলে।

অস্বাভাবিক! হ্যাঁ, যে পোশাকটা একজন মুসলিম নারীর জন্য পরিচিত, স্বাভাবিক হবার কথা ছিল, সেটাই এখানে অস্বাভাবিক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমাইয়া। মানুষ কাফিরদের অনুকরণে স্বকীয়তা কী নির্মমভাবে জলাঞ্জলি দিচ্ছে! ভাবা যায় না।

তবু সুমাইয়ার চেষ্টা থাকে দ্বীনের কোনো-না-কোনো বার্তা এই অবুঝ মহিলাদের কাছে পৌঁছে দেবার। আসরের মহিলারাও আজকাল ওকে নানা রকম প্রশ্ন করে। ভালোই লাগে সুমাইয়ার। অন্তত এই অসিলায় দ্বীনের দাওয়াত তো দেওয়া যাচ্ছে! তবে আজ এক আজব প্রশ্নের সম্মুখীন হলো সে। প্রশ্নটা করেছিল আরিশা। বয়সে তরুণ, সুমাইয়ার সমানই হবে। খুব গোপনে ঘরের এক কোণায় টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সুমাইয়া, তোমার পরিচিত ভালো কোনো হুজুর আছে?'

সুমাইয়া ভেবেছিল হয়তো কোনো আলিমের খোঁজ করছে। ভুল ভাঙতে সময় লাগল না।

স্বামীকে বশ করতে তাবিজ দরকার। সেজন্যই হুজুর খুঁজছে আরিশা।

হতবিহ্বল সুমাইয়া বেশি কিছু বলতে পারেনি। বোঝানোর চেষ্টা করেছে এতে শিরক হবে। আরিশা কতটুকু বুঝেছে কে জানে! ওর কথার ধরনে মনে হয়েছে তাওহিদ, শিরক সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই!

রাতে অফিস থেকে যখন বর ফিরল, সুমাইয়া হড়বড় করে বলে দিল পুরো ঘটনা।

'জানো শফিক, এমনটা কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে জীবনেও ভাবিনি!'

'আমার কাছে কিন্তু অস্বাভাবিক ঠেকছে না। এমনই হবার ছিল।' শফিকের কণ্ঠ বেশ নির্লিপ্ত। 'আচ্ছা সুমাইয়া, তুমি এই কয়দিন কোন কোন বিষয়ে ওদের সাথে আলোচনা করেছ, বলো তো?'

'উমম... এই তো পর্দা নিয়ে কথা বলেছি। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথাও বলেছি।' সুমাইয়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

শফিকের আলোচনা কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না সে।

'তুমি কি বলতে পারো, নবি-রাসূলদের বার্তার সারমর্ম কী ছিল? সর্বপ্রথম তারা কীসের দাওয়াত দিয়েছিল?'

'কেন, তাওহিদ!' চট করে জবাবটা দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারে সুমাইয়া। সে এই কয়দিনের আসরে অনেক কিছুই বলেছে। অথচ তাওহিদ নিয়ে কিচ্ছু বলেনি। আসরের কেউ হয়তো জানেই না তাওহিদ কী। শিরক কোনটা। বিদআতই-বা কী! এই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আলোচনা করা অবান্তর। সংসারজীবনে সুখের সাগরে ভেসে বেড়ালেই-বা কী, যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তাওহিদের জ্ঞানই না থাকে!

'সুমাইয়া, তুমি হয়তো জানো না, সমাজে এখন শিরক আর বিদআত কতটা গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে কী শুনলাম জানো? এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লাভের আশায় ভেড়া বলি দিয়েছে। মানুষ না জেনে, না বুঝে জাদুকরের কাছে ছুটছে সমস্যা সমাধানের আশায়। ওরা শিরকের অর্থই জানে না। এই অবস্থায় আমাদের উচিত বেশি বেশি তাওহিদের দাওয়াত দেওয়া। তুমি কি বুঝতে পেরেছ ভুলটা কোথায়?'

সুমাইয়া মাথা নাড়ে। আগে মানুষের মনে তাওহিদের ভিত গড়ে দেওয়া চাই। নতুবা অগ্নিগহ্বরের কিনারায় সুরম্য অট্টালিকা বানিয়ে কী লাভ!

ছোট ছোট চেষ্টাগুলো

দ্বীনি বোনদের জন্য হালাকার উদ্যোগ নিয়েছিল যাইনাব। সবাইকে দাওয়াতি কাজে অনুপ্রেরণা দিতেই এমন আয়োজন। দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা, নিজের অভিজ্ঞতা আর দাওয়াতি কাজে সামাজিক বাধা—এই তিনটি বিষয় নিয়ে নিজের বক্তব্য সাজিয়েছিল সে। বক্তব্যশেষে ছিল বোনদের সাথে আলোচনা।

কথায় কথায় এক বোন বললেন, মেয়েদের দাওয়াতি কাজের সুযোগ কম। স্বামী-সংসার সামলে খুব কমই অন্যদের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব। অধিকাংশই তার কথায় সায় জানাল।

যাইনাব জানত তাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল। চাইলেই নিজ নিজ পরিসরে বেশ কার্যকরভাবে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব। বোনদের ভুল ভাঙাতে চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করল সে। সবার হাতে একটা করে কাগজ আর কলম দিয়ে দিল। অনুরোধ করল সবাই যেন নিজের জীবনের যেকোনো একটা দাওয়াতি কাজের কথা সংক্ষেপে কাগজে লিখে ফেলেন। সময় ১০ মিনিট।

১০ মিনিট পর কাগজগুলো হাতে নিয়ে যাইনাব অভিভূত। সে কল্পনাও করতে পারেনি দাওয়াতি কাজ এতটা বৈচিত্র্যময় হতে পারে। সবার লেখা কাগজ নিয়ে পড়তে শুরু করল সে।

এক বোন বিভিন্ন ফোরামে লেখালেখি করেন। কখনো সুন্নাহ, কখনো বিদআত, কখনো-বা ফরয বিধান, যেমন—পর্দা নিয়ে বোনদের সতর্ক করে দেন লেখার মাধ্যমে।

আরেক বোন সুযোগ পেলেই কাছের মানুষদের সদুপদেশ, পরামর্শ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করেন। আশপাশের সবাইকে উৎসাহিত করেন অন্যদের দ্বীনের পথে ডাকতে।

পরের কাগজটা হাতে নিয়ে যাইনাব কিছুটা চমকেই গেল। এক বোন নিয়মিত তাওহিদ নিয়ে আলিমদের লেকচার শুনতেন। সেখান থেকে একটু একটু করে তাওহিদের ব্যাখ্যার ওপর সুন্দর নোট করে ফেলেছেন তিনি। এখন সেই নোট বোনদের মাঝে বিলি করেন। আজকের হালাকাতেও বেশ কিছু কপি এনেছেন নোটের। কী অভিনব পদ্ধতি! ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করেও দ্বীনের ক্ষেত্রে কী বিশাল অবদান রাখা সম্ভব!

অন্য এক বোন, একটু ভিন্ন উপায়ে দ্বীন প্রচারের চেষ্টা করেন। অভাবীদের নিজের বিয়ের পোশাক ধার দেন তিনি। প্রয়োজনে একটু সহায়তা হতে পারে দ্বীনের পথে পরোক্ষ দাওয়াত—এমনটাই মনে করেন তিনি।

মোট ৩০টা কাগজ জমা পড়েছিল সেদিন। যাইনাব সবাইকে পড়ে শুনিয়েছিল সব। দারুণ সব আইডিয়া। কেউ হয়তো ভ্রমণে গিয়েছিল, সঙ্গে নিয়েছিল ইসলামি বই। ঘোরাফেরার এক ফাঁকে সেই বইগুলো কোনো এক গ্রাম্য হাসপাতালে বিতরণ করে এসেছে।

কেউ আবার সন্তানসম্ভবা। নবজাতকের আগমনে আত্মীয়স্বজন বাড়িতে আসবে। প্রচুর লোকসমাগম হবে। তাই সে আগে থেকেই কিছু ইসলামি বই র‍্যাপিং পেপারে সুন্দর করে মুড়িয়ে রেখেছে উপহার দেবার জন্য।

শেষ কাগজটায় ছিল চমৎকার এক দাওয়াতি পদ্ধতির কথা। এক বোন তার চেনাজানা পরিবারগুলোতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করেন। এরপর তাকে দ্বীনের দাওয়াত দেন, সাহায্য করেন ইসলামি জ্ঞান অর্জনে। তাকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে চান, যাতে সেই ব্যক্তি নিজেই পরিবারের বাকিদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারে।

সবার লেখা পড়ে শেষ করবার পর যাইনাব প্রশ্ন করেছিল, 'কী আপুরা, এখনো কি আপনারা বলবেন—দাওয়াতি কাজে মেয়েদের সুযোগ কম?'

ততক্ষণে বদলে গেছে হালাকার আবহ। সামান্য চেষ্টায় কত অসামান্য কাজ হতে পারে সে ব্যাপারে আর কারও সন্দেহ নেই!

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি

সকালের নাশতার আয়োজন চলছে। সালেহা এক চুলায় রুটি সেঁকছে, আরেক চুলায় ভাজি। মনটা বিষণ্ণ। গত রাতে সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হলো। ননদের সাথে মন কষাকষি থেকে শুরু। কথা কাটাকাটিও হয়েছে। কতবার যে সে প্রতিজ্ঞা করেছে শ্বশুরবাড়ির কারও সাথে দ্বন্দ্বে জড়াবে না! কোনো লাভ হয় না। তুচ্ছ সব কারণ। চাইলেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। তবু সালেহা ভুল করে বসে। এরপর ডুবে যায় গভীর হতাশায়। সারা দিন কাজের ফাঁকে ভুলগুলো মনের মাঝে হানা দেয়। কোনো কাজেই আর মন বসে না।

নাশতা বানানো শেষ। তবু সাতপাঁচ চিন্তার অবসান হয়নি। অগত্যা ফোন হাতে তুলে নেয় সালেহা। ননদকে ফোন দিয়েছে। আগের রাতের ঘটনার জন্য ক্ষমা চায়। যদিও দোষ দুই পক্ষেরই ছিল। তবু ক্ষমা চায়। যেচে ক্ষমা চাইলে কেউ ছোট হয় না। ননদের গলায়ও একই সুর। সে-ও ভাবির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

সামান্য একটু ফোনালাপে, একটু আত্মগরিমা বিসর্জনে মনটা কত হালকা হয়ে যায়! রবের কাছেও ক্ষমা চাইতে ভোলে না সালেহা। কত ভুল কত গুনাহ, রবের ক্ষমা ছাড়া কোথায় যাবে সে?

সালেহার মা বলত, 'বড় বড় স্বপ্ন সবাই দেখে। কয়জন সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারে বল তো? তুই বরং জীবনটাকে ছোট ছোট ভালো কাজে সাজিয়ে নে। একসময় এ কাজগুলোই তোর স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি হয়ে যাবে। ধাপে ধাপে তোকে পৌঁছে দেবে বড় স্বপ্নের কাছে।'

সালেহা স্বপ্ন দেখে জান্নাতের। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেও আশা করে রবের প্রতিদান। স্বামী অফিস থেকে ফিরলে একটু হেসে দরজা খুলে দেওয়া, সালাম দেওয়া। কঠিন কিছু নয়। বরং নিয়তটা ঠিক করতে পারলে এ কাজেরও প্রতিদান মিলবে।

স্বামী বাজারটা আনলে সালেহা দৌড়ে যায় দরজায়। ভারী ব্যাগের বোঝা সালেহা আর কতই বইতে পারবে! তবু হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলে স্বামীর স্বস্তি হয়। প্রতিদিন স্বামীকে বলে, 'তুমি আমাদের হক আদায়ে এত কষ্ট করছ, আল্লাহ যেন তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেন।'

প্রথম প্রথম সালেহার স্বামী বেশ হাসত। বাজার করা তো তার দায়িত্ব। এতে এত ভণিতার কী আছে! সালেহা বলত ভিন্ন কথা। এ মোটেও ভণিতা নয়। স্ত্রী-সন্তানের হক আদায়ে কষ্ট করছে সে। তার জন্য সালেহা দুআ করবে না তো কে করবে?

এমন আত্মবিশ্বাসী জবাবে স্বামী বেচারা চুপ। কত আচার, কত কথা মানুষের কাছে অদ্ভুত ঠেকে, অপরিচিত ঠেকে। অথচ তা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সালেহার এই দুআও তেমনই।

এরপর চলে বাজার থেকে আনা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার কাজ। সেখানেও সালেহা এমন কিছু করতে চায়, যেন তা রবের সন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুধের টিনে, টিস্যুর বক্সে যত প্রাণীর ছবি, মার্কার দিয়ে নষ্ট করে দেয়। ছেলেমেয়েদের সাথে হাসি-মজা করতে করতে সব কৌটো আর প্যাকেটের ছবি নির্মূল করে চলে। ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায়। সেইসাথে ভালো অভ্যাস আয়ত্তে আনার প্রয়াস।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে সে পড়তে বসে যায়। ইসলামি বই পড়তে পড়তে কেটে যায় সারাটা বিকেল।

আর রাতে চলে সারা দিনের হিসেব-নিকেশ। কয়টা ভালো কাজ হলো। কোনো গুনাহ হয়ে যায়নি তো? ভালো কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সালেহা। ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা চায় আন্তরিকভাবে। দিনশেষে রবের সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই তার।

মনোবলের জয়

এক.

'মিস, ঘণ্টা পড়ে গেছে!'

পেছনের বেঞ্চ থেকে সমস্বরে আওয়াজ আসাতে থামতেই হলো সাদিয়াকে। জীববিজ্ঞানের শিক্ষিকা সে। সবসময় চেষ্টা করে শিক্ষার্থীরা যেন বিজ্ঞানটা বইয়ের পাতায় বন্দি না রেখে জীবনের সাথে মেলাতে পারে। আল্লাহ তাআলা কী অপার মহিমায় এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন! সে কথা বোঝাতে ৪০ মিনিট বড্ড কম সময়। তেরো-চৌদ্দ বছরের মেয়েগুলোও ভীষণ অস্থিরচেতা। ঘণ্টা বাজলেই ওদের কানে আর কোনো কথা প্রবেশ করে না। সাদিয়াও অবশ্য জোরজবরদস্তি করে শেখানোর পক্ষপাতী নয়। তার ওপর ক্লাসটা পড়েছে টিফিনের আগে। এখন পড়ালে ছাত্রীরা আর টিফিনের সময় পাবে না।

'যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি।' কপট রাগ দেখিয়ে হেসে ফেলে সাদিয়া। মার্কার, ডাস্টার গুছিয়ে টিচার্সরুমের পথ ধরে।

'মিস, একটু কথা ছিল।' ক্লাসরুম থেকে দৌড়ে বের হলো ফারজানা। মেয়েটা ক্লাস এইটের ফার্স্ট গার্ল। অসাধারণ স্মরণশক্তি, আচার-আচরণ সবদিক থেকেই বেশ ভালো। সাদিয়ার বেশ পছন্দের ছাত্রী।

'কী ব্যাপার, ফারজানা?'

'মিস, মানবদেহের পরিপাকতন্ত্র নিয়ে গত সপ্তাহে পড়ছিলাম। কিছু জিনিস বুঝতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে আরেকটু বুঝে নিতে চাচ্ছিলাম।'

সাদিয়া মিষ্টি হেসে আশ্বাস দিল স্কুল ছুটির পর বুঝিয়ে দেবে।

'ছুটির পর টিচার্সরুমে এসো। তার আগে বলো, তোমার কুরআন কতটুকু মুখস্থ হয়েছে? কত পারা?'

ফারজানা ইতস্তত করছে। কুরআন যতটুকু মুখস্থ হয়েছে, তা বলার মতো না। মিসকে সে কথা কী করে বলে!

'তুমি স্কুলের পড়ার প্রতি যে মনোযোগ দাও, সেই একই মনোযোগ কি আল্লাহর কিতাব পাঠে দেওয়া উচিত না?' কোমল অথচ খুব দৃঢ়তার সাথে সাদিয়া বলে চলেছে। 'আমি চাই তুমি কুরআন পাঠেও মনযোগী হও। প্রতিদিন একটু একটু করে মুখস্থ করা শুরু করো। প্রয়োজনে আমার কাছে মুখস্থ পড়া দিতে পারো। সময় নিয়ে অর্থটাও পড়বে, ঠিক আছে?'

ফারজানা মাথা নাড়ে। সাদিয়া মিস কখনোই নিরুৎসাহিত করেন না। ভুলগুলো অমায়িকভাবে শুধরে দেন। ছাত্রীরা যেমন তাকে শ্রদ্ধা করে, ঠিক তেমনি ভালোও বাসে।

দুই.

'ওই যে আসছে!'

চোখের ইশারায় সাদিয়াকে দেখায় সারিতা। ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি। ও টিচার্সরুমে ঢুকলেই যেন সবাই প্রসঙ্গ পাল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সাদিয়া জয়েন করার পর থেকেই দেখছে কলিগদের মূল আলোচনা শাড়ি কাপড় আর গয়না। অথবা কারও নামে গীবত। কে কীভাবে হাঁটে, কে কেমন করে কথা বলে—এসব আলোচনাতেই সময় কেটে যায়।

সাদিয়া সুযোগ পেলেই সহকর্মীদের আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যতটা সময় টিচার্সরুমে থাকে, দ্বীনের কথা বলে। আস্তে আস্তে সহকর্মীদের মাঝে পরিবর্তন হতে থাকে। তবু কিছু মানুষ তো থাকেই যারা নিজের ভুল স্বীকার করতে রাজি নয়।

এই যেমন ইংরেজির শিক্ষিকা সারিতার কথাই ধরা যাক। গীবতের ব্যাপারে ভীষণ বেখেয়াল সে। তার সংস্পর্শে অন্য শিক্ষিকারাও সব বাধা ভুলে গিয়ে পরচর্চায় মগ্ন হয়ে যায়। গীবতের আসর ঠেকাতে সাদিয়া একটা কার্ড টিচার্সরুমের টেবিলে সেঁটে দিয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল—

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান করা থেকে দূরে থেকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো।[১]

এতে করে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটল। যে-ই গীবত করতে যায়, কার্ডটা চোখে পড়লে থেমে যায়। কখনো-বা একজন আরেকজনকে কার্ডের দিকে ইঙ্গিত করলেই কাজ হয়ে যায়। একদিন সারিতাকে কার্ডের দিকে ইঙ্গিত করে সাদিয়া পড়ল বিপাকে। সাদিয়াকে যা নয় তা-ই বলে অপমান করল সারিতা।

সেদিন সাদিয়া নিজেকে সংযত রেখেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে স্মরণ করছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদিসটি—

“

শক্তিশালী সে নয়, যে নিজের শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে কুপোকাত করে; বরং শক্তিশালী তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের রাগকে সংবরণ করে।[২]

সাদিয়া জানত, দাওয়াতি কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাইলে মানুষের অপবাদ, নিন্দার মূল লক্ষ্যবস্তু হতেই হবে। দ্বীনে উদাসীন ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে অপদস্থ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেই। অন্তর জাগ্রত না হলে অন্যের সমালোচনা করা সহজ। তাই হতাশ হয় না সে। ধৈর্য ধরে সে দাওয়াত দিয়ে যায়। কখনো কারও প্রতি মনের মাঝে ক্ষোভ পুষে রাখে না।

---

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১২

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬১১৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৬০৯

তিন.

সকাল থেকেই আজ মনটা ভালো সাদিয়ার। ফারজানা জানিয়েছে সে কুরআনের শেষ পারাটা মুখস্থ করে ফেলেছে। সেইসাথে একটু একটু করে তাফসির পড়ছে। কম বয়েসি ছেলেমেয়েদের অন্তর সবসময় ভালোটা গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সামান্য একদিনের নাসিহায় ফারজানা কত দ্রুত নিজেকে বদলে নিয়েছে। সবাই কি এমনটা পারে? কত মানুষ সত্য উপদেশ পেয়েও মুখ ফিরিয়ে নেয়! গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল সাদিয়া। সংবিৎ ফিরল সারিতার কণ্ঠে।

আজ রেজাল্ট কার্ড তৈরির শেষ দিন। সারিতার এখনো কাজ শেষ হয়নি। কখন কার্ড তৈরি করবে, কখন জমা দেবে তাই নিয়ে চলছে হা-হুতাশ। সাদিয়ার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সারিতার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?'

সারিতা হতবাক। এই মানুষটাকে কত কথা শোনায় সে। কত টিপ্পনী, কত হাসাহাসি। তবু তাকে সাহায্য করতে চায়! মাথা নেড়ে সায় দেয় সারিতা। কিছু রেজাল্ট কার্ডে নাম্বার তুলে দিলে উপকার হয় তার। সাদিয়াও দেরি না করে চেয়ারে বসে পড়ে। যে মুসলিম অপর মুসলিমের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। এ কথা সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করে সে।

কাজ শেষে সাদিয়ার হাত ধরে ক্ষমা চেয়েছিল সারিতা। মন ভালো করা দিন ছিল সেটা। দাওয়াতি কাজে উৎসর্গীকৃত জীবন এমনই। কখনো দুঃখকষ্ট বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কখনো মানুষের কথায় হৃদয়টা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এ সবকিছু মেনে নিয়েই সৎনিয়ত আর ইচ্ছাশক্তিকে পুঁজি করে চালিয়ে যেতে হবে দ্বীনের দাওয়াত। প্রাপ্তির খাতা যদি ভরে ওঠে রবের সন্তোষে, তবে ক্ষণিকের বেদনায় ভয় কী!

নয়নজুড়ানো উপহার

ব্যস্ততার মাঝেও আহসানকে চা দিয়ে যায় বিনীতা। আহসান জানে আজকের ছুটির দিনটা অন্যরকম। বিনীতার ড্রিম প্রজেক্টের কাজ চলছে। বস্তা বস্তা কাপড় ওপরে দিয়ে গেছে দারোয়ান চাচা, আরও আছে ঘরের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জিনিসপত্র।

ছয় মাস পর পর দ্বীনি বোনদের আহ্বান করে বিনীতা। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রচুর জিনিস জমা হয়। তারপর সেই জিনিস ভাগ করে দেওয়া হয় গরিব কিছু পরিবারকে। কখনো বিনীতা নতুন জামা কিনে দান করে, কখনো-বা অতিরিক্ত জিনিস অনলাইনে বিক্রি করে টাকাটা দান করে দেয়। অনেকের থেকে টাকা নিয়ে পরিচিত অপরিচিত গরিব পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয় তালিকা তৈরি করে সে। তারপর সেই অনুযায়ী সাহায্যের চেষ্টা চালায়।

অভাবী পরিবারগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখে আহসানের গাড়ির ড্রাইভার, এটা তার আরেক চাকরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জান্নাতে আবাস গড়তে দ্বীনি বোনদের অস্থিরতা আর প্রচেষ্টা অবাক করে দেয় আহসানকে। কখনো এদের কর্মোদ্যম দেখে মনে হয়, পুরুষরাই বুঝি পিছিয়ে যাচ্ছে! মাঝে মাঝে বিনীতাকে একটু কমাতে বলে এসব কাজ। বিনীতা তাকে বোঝায়, এটা এমন এক কাজ যা তাদের হাশরের ময়দানে পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করবে। আর জান্নাতে এক সুন্দর ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে।

এমন জবাবে আহসানের মনে হয় এরাই আয়িশা ও ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুমার যোগ্য উত্তরসূরি। ফাস্টফুড আর নিত্যনতুন বাইরের খাবারে অভ্যস্ত বিনীতা এক হাদিসে বদলে নিয়েছিল নিজেকে।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দুইবেলা করে খেতেন। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'হে আয়িশা, তুমি কি চাও উদরপূর্তিই তোমার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াক?'[১]

এই হাদিসটা জানার পর থেকে অতিরিক্ত খরচ কমিয়ে ফেলেছে বিনীতা। মাসের শেষে আর বেতন নিয়ে চিন্তাও করতে হয় না আহসানের। কৃতজ্ঞতায় অন্তর রবের প্রতি নুয়ে আসে তার। এমন চক্ষুশীতলকারী স্ত্রীর কথাই তো কুরআনে বলা হয়েছে!

[১] *শু'আবুল ঈমান*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৪৪১। হাদিসটি দুর্বল।

পরের তরে

'থার্টি ফোর...রোল নাম্বার থার্টি ফোর! শারমিন সুলতানা আসেনি?' এটেন্ডেন্স খাতা থেকে মুখ তুলে ক্লাসরুমে চোখ বোলায় ফাতিমা। পাঁচ দিন ধরে শারমিন অনুপস্থিত। কী হলো মেয়েটার? পড়ালেখায় মোটামুটি হলেও ক্লাসে নিয়মিত আসত।

'তোমরা কি কেউ জানো, শারমিন কেন আসছে না?'

ক্লাসরুমে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সবাই কিছু না কিছু বলছে নিজেদের মাঝে। 'এটেনশন!' ডাস্টার দিয়ে টেবিলে বাড়ি দেয় ফাতিমা। এদের না থামালে পুরো ক্লাসজুড়ে গল্প করে যাবে।

'নিজেদের মধ্যে গল্প করতে বলিনি কিন্তু! শারমিনের খবর জানো কেউ? থার্টি ফাইভ, তুমি জানো? তোমার পাশেই তো বসত!'

রোল থার্টি ফাইভ মাথা নাড়ে। এই ক'দিনে কেউই মেয়েটার খোঁজ নেয়নি। হতাশ লাগে ফাতিমার। এতগুলো মেয়ে, কেউ তার খবর জানে না। হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে ছাত্রীদের উপদেশ দেয়, 'সহপাঠীদের খোঁজখবর রাখতে হয় মেয়েরা। তোমরা বড় হচ্ছ। ও শুধু তোমাদের সহপাঠী নয়, প্রতিবেশীও।

একই এলাকায় থাকো তোমরা সবাই। কেন খোঁজ নাওনি তাহলে?' মেয়েরা নিশ্চুপ। ফাতিমা আর কথা বাড়ায় না। এক ছাত্রীর কাছ থেকে শারমিনের

বাসার ফোন নাম্বার নেয়। এরপর ফিরে যায় এটেন্ডেন্সের খাতায়। ক্লাসশেষে খোঁজ নিতে হবে মেয়েটার।

ফাতিমা বিশ্বাস করে দ্বীনপালন কেবল পরিবার কিংবা স্কুলের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। আত্মীয়দের হক আছে, প্রতিবেশীর হক আছে। এতগুলো মেয়ে এই প্রতিষ্ঠানে পড়ছে, তাদের ব্যাপারেও ফাতিমার দায়িত্ব রয়েছে। স্কুলের ঘণ্টা পড়লেই তাই মন থেকে ছাত্রীদের মুছে দিতে পারে না সে। চেষ্টা করে খোঁজ-খবর রাখার।

ক্লাসশেষে তাই ফোন দিয়েছিল শারমিনের মাকে। মেয়েটা বিছানায় পড়ে আছে পাঁচ দিন ধরে। ঠিকমতো খেতে পারছে না। পেটে ভীষণ ব্যথা। বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে নারাজ। তার কথা—মেয়ে নিজের দোষে পেটের অসুখ বাঁধিয়েছে। এখানে তার কিছুই করার নেই।

এমনতর কথা শুনে অবাক হয়নি ফাতিমা। মানুষের সাথে মিশতে গিয়ে তার ঝুলিতে গল্প জমেছে অনেক। পৃথিবীতে কত যে বিচিত্র মানুষের বসবাস! ফোনের পর শারমিনের বাসায় হাজির হয়েছিল ফাতিমা। তার বাবার অনুমতি নিয়ে নিজেই ডাক্তার দেখাল, টেস্টের ব্যবস্থা করল। বেশ ক'দিনের দৌড়াদৌড়ির পর ধরা পড়ল, ক্যান্সার হয়েছে শারমিনের।

মেয়েটার জীবনটা আটকে গেল হাসপাতালের বেডে। সারা দিনে তার একমাত্র আনন্দ ছিল ফাতিমা মিসের আগমন। প্রতিদিনই ওকে দেখতে যেত ফাতিমা। যথাসময়ে সালাত আদায়ের তাগাদা দিত। অসুস্থ থেকে সুস্থ হবার দুআ পড়ে দিত। শারমিনকেও শেখাত। আল্লাহর কাছে শিফা চেয়ে সুন্নাহসম্মত দুআ। সুন্দর সময় কাটত একাকী শারমিনের।

ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন আশা নেই আর। ফাতিমা শক্ত হয়ে শারমিনের শেষ সময়টাতে পাশে থেকেছিল। স্কুল থেকে সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল মেয়েটার জন্য। হাজার হোক মেয়েটার বাবা থেকেও নেই।

পুরোটা সময়জুড়ে চেষ্টা করে গিয়েছিল মেয়েটা যেন ধৈর্যহারা হয়ে না যায়। আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন গাফিল না হয়ে যায়। আল্লাহ ফাতিমার প্রচেষ্টা কবুল করে নিয়েছিলেন।

শারমিন তার রবের সান্নিধ্যে চলে গেছে। যাবার আগের সময়টা কাটিয়েছে ইবাদতে আর ক্ষমা প্রার্থনায়, ঠিক যেমনটা ফাতিমা চেয়েছিল।

শূন্য মরুভূমি

সালেহার মনটা বিষণ্ন। রিমির পরিণতি কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না। মনে পড়ে যাচ্ছে কলেজ-জীবনের কথা। কমনরুমে বসে সুরা মুমিনুনের ১১৫ নম্বর আয়াতটা তিলাওয়াত করছিল রিমি। অর্থটা থমকে দিয়েছিল ওদের।

তোমরা কি তবে মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং আমার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে না?

সে সময় সালেহা কেবল দ্বীন মানতে শুরু করেছে। জাহিলিয়াতের অনেক কিছুই ছাড়তে পারেনি। পোশাক, গয়না, জুতা আরও কত কী নিয়ে সীমাহীন আগ্রহ ছিল! একবার তো একজোড়া জুতো সাইজে মেলেনি বলে সারা দিন হা-হুতাশ করে কাটিয়ে দিল। তখনই রিমি ওকে আয়াতটা তিলাওয়াত করে শোনায়। সালেহাকে বোঝায়, পার্থিব জীবনের পিছে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে কোনো কল্যাণ নেই।

রিমি মেয়েটা নেক আমল দিয়ে জীবন সাজাবার আহ্বান করত। ওর উৎসাহেই সালেহা তাহাজ্জুদের অভ্যাস করে। মুমিন কখনো অলস সময় কাটায় না। ছোট ছোট ভালো কাজ করে হলেও আমলের পাল্লা ভারী করতে চায়। যখনই ভোগবিলাসের জীবন হাতছানি দিয়ে ডাকত, সালেহা তার রবের বাণী স্মরণ করত—

আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য।[১]

যে মানুষটার কথায় কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সালেহা আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করছিল, সেই মানুষটা আমূল বদলে গেছে। ১০ বছর আগের রিমির সাথে এখনকার রিমির আকাশপাতাল ফারাক। আপাদমস্তক বোরকা ছেড়ে বাহারি হিজাব। দামি গয়না, জুতো জোড়াও আনকোরা। সালেহা মেলাতে পারে না। কী আমূল পরিবর্তন! কষ্ট চেপে হাদিস মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল সালেহা—

❝

কিয়ামতের দিন কোনো বান্দাই নিজের জায়গা ছেড়ে এক চুলও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে—সে নিজের জীবনকে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে; তার যৌবনকাল সে কোন কাজে কাটিয়েছে; নিজের ধনসম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোন কাজে ব্যয় করেছে; নিজের ইলম অনুসারে কী পরিমাণে আমল করেছে?[২]

রিমির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ফিরে গেছে জাহিলিয়াতের জীবনে। ফুলে ফলে সুশোভিত জমিন পরিণত হয়েছে শুষ্ক, শূন্য মরুভূমিতে।

---

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৯

[২] *জামি তিরমিযি* : ২৪১৭, হাদিসটি সহিহ

পবিত্র বন্ধন

ফারহানার বিকেলটা কাটে নবীজির সিরাহ পড়ে। বিয়ের উপহার। কত কী উপহার পেয়েছিল বিয়েতে! কত দামি দামি গয়না আর শাড়ি! এক বান্ধবী দিল একদম ভিন্ন কিছু—কুরআনের তাফসির আর সিরাহ। বইগুলো দেখে আর কোনো উপহারই হৃদয়ে দাগ কাটতে পারেনি ফারহানার। যেন ওর ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগ্রত করতেই এমন উপহার। তাই প্রতিদিন একটু হলেও বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখার চেষ্টা করে সে। ভুলে যাওয়ার ভয়ে এলার্ম দিয়ে রেখেছে ফোনে।

আজকের এলার্মটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ তারিখে চোখ পড়ে গেল ফারহানার। আজকের দিনটাই তো! হ্যাঁ, আজকের এই দিন থেকে ঠিক এক বছর আগে দুজন অপরিচিত মানুষ একে অপরকে আপন করে নিয়েছিল। সময় কত দ্রুত বয়ে যায়! মনে হয় এই তো সেদিন বিয়ে হলো। অথচ এর মাঝেই একটা বছর পেরিয়ে গেছে!

সাদিক আর ফারহানার বিয়েটা ছিল স্বপ্নের মতো। ফারহানা খুব করে চাইত তার বিয়েটা যেন ইসলাম মেনে হয়। সাদিকও তাই। জায়নামাযে মাথা ঠুকে রবকে নিজেদের স্বপ্নের কথা জানিয়েছিল তারা। রব তাদের ফিরিয়ে দেননি। বিয়েটা হয়েছিল শরিয়তের সীমার মাঝেই।

সে অনুষ্ঠানে ছিল না নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ছিল না অপচয়। ছিল না কোনো বাড়াবাড়ি। আনন্দ প্রকাশের জন্য ছিল ছোট বাচ্চাদের বাজনাবিহীন গানের আয়োজন আর প্রতিযোগিতার আসর। আসর শেষ হয়েছিল নবদম্পতির জন্য

বরকতের দুআ করে। অবিবাহিতদের বিয়ের জন্য দুআ করতেও কেউ ভোলেনি।

সব বিয়েতে যেমন হয়—একসাথে বসে কারও-না-কারও কিছু না কিছুর বদনাম করা। বউ দেখতে ভালো না, কাচ্চিতে আলু কম অথবা বোরহানির স্বাদ নেই—এই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়েছিল সাদিক। খাওয়া-দাওয়ার পর্বে ছিল বাড়তি সতর্কতা। বুদ্ধি করে প্রতি টেবিলের জন্য ছোট ছোট চিরকুটের ব্যবস্থা করেছিল সে। সেখানে লেখা ছিল কুরআনের একটি আয়াত—

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান করা থেকে দূরে থেকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো।[১]

ফারহানার এখনো মনে আছে বিয়ের আগের মুহূর্তগুলো। সাদিকের পরিবার দেখতে এলো তাকে। দেখাদেখির পর্ব নিয়ে বান্ধবীদের কত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা শুনেছে! সে খুব করে চাইত আল্লাহ যেন তাকে আর তার পরিবারকে অসম্মানের মুখোমুখি না করেন। হয়েছিলও তাই। সাদিকের পরিবারের কাউকে দেখেই মনে হয়নি পাত্রী দেখতে এসেছে। ফারহানার মা-ও যথাসম্ভব আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। ঘরে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত শাশুড়ি। ব্যস্ততার শেষ নেই। তবু আন্তরিকতার কমতি ছিল না। মহিলা অতিথিদের অনুরোধ করেছিলেন শাশুড়ির ঘরে গিয়ে গল্প করতে। একাকী মানুষটা খুশি হবেন।

ফারহানা বিয়ের পর জেনেছিল, তার মায়ের সদয় আর বিচক্ষণ আচরণ দেখেই সাদিকের মা ঘোষণা দিয়েছিলেন, এখানেই বিয়ে হবে। যার মা এত সহমর্মী আর ধার্মিক, তার মেয়ে নিশ্চিত সংসারকে মায়া দিয়ে আগলে রাখতে পারবে।

অবশ্য সবকিছু যে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট ঝামেলাবিহীন হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। ফারহানার বড় চাচা একদম শেষ সময়ে এসে বাঁধ সেধে বসেছিলেন। ছেলের পরিবার আর্থিক দিক থেকে তেমন সচ্ছল নয়। এমন পরিবারে কেন তাদের আদরের কন্যাকে পাঠানো হবে? তাকে বোঝাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি ফারহানার।

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১২

সাদিক ছেলেটা ঈমানের দিক থেকে, সুন্নাহ পালনে এগিয়ে রয়েছে। এসব ছাড়িয়ে অর্থকড়িই বড় হয়ে গেল? শেষমেশ ফারহানা চাচাকে সেই হাদিসের কথা মনে করিয়ে দেয়—

❝

যদি এমন কেউ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় যার ঈমান ও সুন্নাহ পালনে তুমি সন্তুষ্ট, তবে তাকে বিয়ে করো।[১]

চাচাকে সে বলেছিল, 'ঈমান আর রাসুলের সুন্নাহ পাখির দুটো ডানার মতো। এই ডানায় ভর করে একটা পরিবার স্বচ্ছ আকাশে মুক্ত বিহঙ্গা হয়ে উড়ে বেড়াতে পারে।

চাচা, ছেলের ঈমান আর সুন্নাহ পালন নিয়ে কি আপনার কোনো আপত্তি আছে? যদি থাকে, তবে আমিও এ বিয়েতে আগ্রহী নই।'

চাচা নিরুত্তর ছিলেন। আর মা-বাবা তো শুরু থেকেই উৎসাহী। সত্যি বলতে সাদিকের দ্বীনপালন নিয়ে কারও ভাববার অবকাশ ছিল না। সুখী জীবন কাটানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি নিশ্চিত। অভিভাবকরাও আর দেরি করেননি। খুব দ্রুত বিয়ে হয়ে যায় সাদিক আর ফারহানার। স্রষ্টার বেঁধে দেওয়া নিয়মে শুরু হয় তাদের নতুন পথযাত্রা। এ যাত্রার গন্তব্য হোক জান্নাত।

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ১০৮৪

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ উপলক্ষ্যে

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক
০১	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ
০২	ফেরা-২	বিনতু আদিল
০৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা
০৪	হৃদয় জাগার জন্য	ইয়াসমিন মুজাহিদ
০৫	জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো	ড. হানান লাশীন
০৬	বাক্সের বাইরে	শরীফ আবু হায়াত অপু
০৭	কাজের মাঝে রবের খোঁজে	আফিফা আবেদীন সাওদা
০৮	সুখের নাটাই	আফরোজা হাসান
০৯	ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ	আবুল হাসানাত
১০	ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন
১১	ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
১২	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ	যোবায়ের নাজাত
১৩	হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ	আব্দুল বারী
১৪	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ	আবুল হাসানাত

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য (টাকা)
০১	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৩৬
০২	পড়ো	ওমর আল জাবির	২২০
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৪	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩০০
০৫	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৫০
০৬	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
০৭	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৩৫
০৮	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
০৯	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
১০	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার	২৩২
১১	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	১৭৫
১২	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৯০
১৩	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৭২
১৪	সেইসব দিনরাত্রি	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
১৫	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
১৬	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	১৭৬
১৭	মেঘ কেটে যায়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
১৮	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩১৫
১৯	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	১৮৫
২০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়্যুম আস-সুহাইবানী	১৪১
২১	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০
২২	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
২৩	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	২৫০
২৪	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০
২৫	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮

কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলেও (বিচার দিবসে) সে তা দেখতে পাবে।

[সুরা যিলযাল, আয়াত : ৭]

অতি ক্ষুদ্রকায় বীজ, যৎসামান্য বস্তু, অথচ একদিন সেটা বটবৃক্ষ হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। প্রকাণ্ড সব ডালপালা মেলে ধরে বিস্তীর্ণ পরিসরে। জগতের যা কিছু নতুন, যা কিছু সত্য আর সুন্দর, যা কিছু পরম আর পবিত্র, তার শুরু তো এই ক্ষুদ্র থেকেই। কবির ভাষায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল। হ্যাঁ, আমরাও বুনেছি নেক আমলের বীজ। একদিন পরম যত্ন, মমতা আর ভালোবাসার ছোঁয়ায় এই বীজ পরিণত হবে গগণচুম্বী মহিরুহে। সুশীতল ছায়া, সুমিষ্ট ফল আর সবুজের মেলা—সবই তো পাব তার থেকে। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এমন একটি মহিরুহ দেখব বলে আমরা রোপণ করেছি ভালোবাসায় মোড়া বিশুদ্ধ এক স্বপ্নচারা। সেই স্বপ্নচারাটির নাম 'কাজের মাঝে রবের খোঁজে'।